একাকিনী নায়িকা

একালিনী নায়িকা

ভবানী মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাব্‌লিশার্স
কলিকাতা

একালনা নায়িকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৫২

আড়াই টাকা

[illegible] পক্ষে প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রিন্টিং হাউসের পক্ষে মুদ্রাকর—পুলিনবিহারী সামন্ত, ৭০, অপার সাকু´লার রোড, কলিকাতা

ছদসজ্জা—আশু বন্দোপাধ্যায়,……………ব্লক ও মুদ্রণ—ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও,

[illegible]ই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স,………সহায়ক—শ্রীপ্রতাপকুমার সিংহ, বেঙ্গল পেপার মিলস্

মনোজ বসু

বন্ধুবরেষু—

১০ই আশ্বিন, ১৩৫২

ভবানী মুখোপাধ্যায়

এই লেখকের—

স্বর্গ হইতে বিদায় (২য় সং)	২৲
নির্জন গৃহকোণে (২য় সং)	২৲
যথাপূর্বং	২৲
কালোরাত	২৲
মুখ ও মুখোস (যন্ত্রস্থ)	২৲

অ নু বা দ

বিপ্লবী যৌবন (২য় সং) (Ben-B. Lindsay'রচিত Revolt of Modern youth) গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ	৪।৹
অখণ্ড জগৎ (২য় সং) (Wendell willkie রচিত "ONE WORLD" গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ)	৩।৹

আকাশ সকাল থেকেই মেঘে ঢাকা।

এই অঞ্চলের আকাশে সাধারণতঃ এ ধরণের মেঘ দেখা যায় না, কিন্তু এমন অসময়ে সেই মেঘ দেখে মনে একটু শংকা বা সংশয় জাগেনি! আশা ছিল ছায়ায় ছায়ায় যাওয়া চলবে, পথে প্রখর সূর্য কিরণের দুর্ভোগ ভুগতে হবে না।

বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসে এতক্ষণে কিন্তু জয়তী সত্যই নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করল। হাওয়ায় ভেসে আসছে ভিজে মাটির গন্ধ, আর সে হাওয়াও তেমন মিঠে নয়। এই জনশূন্য প্রান্তরে যদি বর্ষা নামে তাহ'লে জয়তীর দুর্গতির সীমা থাকবে না। পথ এখনও বহুদূর।

কিন্তু আবহাওয়া নিয়ে যে দেবতার কারবার, তাঁর প্রাণে মমতা নেই, প্রয়োজন বা অপ্রয়োজন বোধের অভাব আছে। স্থান-কাল জ্ঞানহীন সেই দেবতার ইঙ্গিতে তাই সহসা প্রবল বেগে বর্ষণ শুরু হোল।

বিব্রত হয়ে জয়তী তাড়াতাড়ি গাড়ি থামিয়ে সাইড স্ক্রীন কটা পরিয়ে, বর্ষাতিটা গায়ে কঠিন করে এঁটে নিলে। গাড়ি আবার জল কাদা ঠেলে ছুটলো বটে, কিন্তু 'উইণ্ড স্ক্রীনে' সামনের পথ আর

স্পষ্ট দেখা গেল না, সমস্তই বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। যে-যন্ত্রটি এই দুর্যোগে বিশেষ প্রয়োজনীয়, সেই 'ওয়াইপার'টি মাঝে মাঝে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, প্রতিবারেই জয়ন্তীকে সেটা হাত দিয়ে চালিয়ে দিতে হচ্ছে।

গাড়ির হুডের ভিতর দিয়ে জল আর হাওয়া দু'টি বস্তুই গাড়ির ভেতর প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হচ্ছে। হাওয়ার বেগে ক্ষুদ্র গাড়িখানিও মাঝে মাঝে তাল সামলাতে পারছিল না, অথচ এমনই মুস্কিল, কাছাকাছি লোকালয়ের কোন চিহ্নমাত্র নেই।

গাড়িটিকে উদ্দেশ করে জয়ন্তী সস্নেহ কণ্ঠে বল্লে—যতই কষ্ট দাও 'বেবী', যথাকালে আমাকে পৌছে দিও কিন্তু।

'বেবীর' উদ্দেশ্য কিন্তু অতখানি সাধু নয়, কারণ কিছুক্ষণ পরেই বিচিত্র শব্দ সহকারে 'বেবী' যেন শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌লে. গাড়ি আর এক বিন্দুও অগ্রসর গেল না। গাড়িখানি অতিকষ্টে একপাশে সরিয়ে রেখে জয়ন্তী সেই বর্ষণমুখরিত প্রান্তরে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, কোথায় যে আসা হয়েছে, কাছাকাছি জন-মানবের কোন সন্ধান মেলে কিনা, কিছুই বোঝা গেল না। গভীর হতাশাভরে জয়ন্তী বল্লে—অবশেষে এই বেয়াড়া জায়গায় অচল হ'য়ে রইলি, পথ যে এখনও অনেক বাকী।

'বেবী'র রাগটা যে কি জাতীয় বোধ করি তা পরীক্ষা করার জন্যই জয়ন্তী ধীরে ধীরে 'বনেট'টা তুলে ধরলো, দু'একটা যন্ত্র নেড়ে চেড়ে গাড়িটার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার ব্যর্থ চেষ্টা করল—গাড়ি কিন্তু তেমনই নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল। রোগটা ঠিক কোন অঞ্চলে তা সহজে বোঝা গেল না।

অবশেষে গাড়িখানি সেখানেই রেখে জয়ন্তী লোকালয়ের সন্ধানে

পায়ে হেঁটেই অগ্রসর হোল। বর্ষাতির কলারটি টেনে গলাটা ঢেকে দু'টি পকেটের মধ্যে দু'হাত প্রবেশ করিয়ে গভীর বিরক্তিভরে জয়ন্তী শহর আবিষ্কারে অগ্রসর হোল।

পথের মাঝে সঞ্চিত জল আর কাদায় জয়ন্তীর দু'একবার পা ডুবে গেল। একে অজানা পথ, তার ওপর ক্রমশঃ সন্ধ্যা হয়ে আসছে, নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য জয়ন্তী নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগলো। এভাবে একা এমনি চলে আসা হয়তো উচিত হয়নি। পথ এঁকে বেঁকে ঘুরে গেছে, অনেক দূর যাবার পর একটি পথে আলোর চিহ্ন পাওয়া গেল। আলো যখন দেখা গেল, শহর যে আর বেশি দূর নয়, এই কথা মনে করে জয়ন্তীর বিষণ্ন গম্ভীর চিত্ত এতক্ষণে খুসীর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। কাছাকাছি পেট্রোল স্টেশন খুঁজে বার করতে পারলে গাড়ি মেরামত করা শক্ত হবে না, হয়তো আজই যথাস্থানে পৌঁছাতে পারা যাবে। গাড়িখানি সারাবার ব্যবস্থা করতে না পারলে আবার একটা হোটেল খুঁজে বার করতে হবে, পথে বেরিয়ে বিপদ কি একটা! হতভাগা গাড়িটা যেন তাকে বিব্রত করবার জন্যে ভেতরে ভেতরে একটা ষড়যন্ত্র করে বসেছিল।

এমনই বিচিত্র দেশ, এতখানি পথ কাটিয়ে এলেও গাড়ি ঘোড়া ত' দূরের কথা একটা লোকেরও মুখ দেখা গেল না যে কোনো একটা সন্ধান মিলবে। সকাল থেকেই গাড়ি চালিয়ে চালিয়ে জয়ন্তী অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তার ওপর সে এখন শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত, দেড় মাইল পথ হেঁটে আসা গেছে, পা যেন আর চলে না। এমন সময় অদূরে মোটরের হর্ণ এবং আলো দেখা গেল। মোটরের আলো না বলে আশার আলো বলাই বোধ করি সঙ্গত হত।

জয়ন্তী পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাড়িখানির দিকে ইঙ্গিত করবার

জন্যেই শূন্যে রুমাল ওড়াতে লাগল। সেই বিশাল গাড়িখানি জয়তীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মোটরের ভিতর থেকে স্নিগ্ধ কণ্ঠে যিনি প্রশ্ন করলেন—কিছু বলবেন কি? তিনিই যে গাড়ির মালিক জয়তী তা নিঃসন্দেহে বুঝে নিল, আরো সৌভাগ্য যে, তিনি বাঙালী। প্রকাণ্ড লাইমুসিন গাড়ি।

জয়তী কুণ্ঠিত কণ্ঠে জানালো—বড় মুস্কিলে পড়ে আপনাকে থামাতে হোল। আমার গাড়িটা, হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল, অথচ এমন কাউকেই দেখতে পেলাম না যার কাছ থেকে কোন কিছু সন্ধান মেলে। আপনি বলতে পারেন, এ-জায়গাটার নাম কি, কাছাকাছি গাড়িটা মেরামত করানোর সুবিধা আছে কিনা, আর ডাক-বাংলো কিংবা হোটেল?…

ইঞ্জিনের সুইচ বন্ধ ক'রে ভদ্রলোক হেসে বল্লেন—তাহলে ভারি মুস্কিলে পড়েছেন ত' আপনারা? গাড়িটা কোথায়?

জয়তী বল্লে—গাড়ি ছাড়িয়ে প্রায় এক মাইলের ওপর এসে পড়েছি আপনার কি মনে হয় দু' তিন ঘণ্টায় মেরামত হয়ে যেতে পারে?

জয়তীর কথাগুলি বৃহৎ গাড়ির মালিককে বিশেষ কৌতুহলী করে তুললো। তিনি প্রশ্ন করলেন—কোথা থেকে আসছেন আপনারা, যাবেন কোথায়?

জয়তী বল্লে—গৌরবে বহুবচন করে বলতে বাধ্য হচ্ছি, 'আপনারা' অর্থে আমি একা। আসছি আগ্রা থেকে, যাব দিল্লী।

সারা পথ কি একাই কার নিয়ে আসছেন? বাহাদুরী আছে। কিন্তু 'দিল্লী দূর অস্ত', এখনও অনেক দূর, এ জায়গাটার নাম কোসী-কালান, মথুরার কাছাকাছি। হোটেল বা ডাক-বাংলো আছে কিনা

ঠিক বলতে পারি না কারণ আমিও বহুকাল এদিকে আসিনি। আপত্তি না থাকলে আমার কারে উঠে আসুন না!

—কিন্তু আমার বেবী? আমার সুটকেস, সবই যে পড়ে রইল।

—বেবী?

—হ্যাঁ, আমার বেবী মরিস্। যদিচ পুরাতন এবং ছোট, তবু আমার বড় আদরের সামগ্রী।

বৃহৎ গাড়ির মালিক এতক্ষণে বিশেষভাব লক্ষ্য করে জয়ন্তীর মুখখানি দেখলেন,—অল্পই বয়স, প্রসাধনের পারিপাট্য নেই, থাকলেও তা বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তবু তার সৌন্দর্য এক বিন্দু ম্লান হয়নি। সারল্য ও সুষমায় সারা মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ভদ্রলোক বল্লেন—বেশ ত! ওখানে গিয়ে সুটকেশ তুলে নিলেই হবে, তারপর গাড়ি সারাবার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত 'বেবী'কে এই পথের ধারেই দিন কাটাতে হবে। এ ছাড়া আর পথ নেই। গাড়ির দরজা সসম্ভ্রমে খুলে জয়ন্তীকে উঠে আসবার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

গাড়ির গদিতে বিশ্রান্ত ভঙ্গীতে সারা দেহখানি ছড়িয়ে দিয়ে বসে জয়ন্তী সর্বপ্রথম অনুভব করলো কি পরিশ্রান্তই না সে হয়েছে। এমন কি 'বেবী' কার খানির অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্বন্ধে দু' একটি কথাও মনে এল, কিন্তু তা নেহাৎই ক্ষণিকের জন্য। কেন না আর যাই হোক 'বেবী'র ওপর অকৃতজ্ঞতা জয়ন্তী কিছুতেই করতে পারে না। তবে এমনই একখানা 'গাড়ি' থাকলে মন্দ হোত না, যেন হাওয়ায় হাওয়ায় গাড়িখানা উড়ে চলেছে।

তারপর এই সংকটময় মুহূর্তে এই যে ত্রাণকর্তার আবির্ভাব হ'ল, কে ইনি? যিনিই হোন লোকটি ভদ্র, সভ্য, এবং সুদর্শন। গাড়ি আর

আকৃতিতে আভিজাত্যের চিহ্ন পরিস্ফুট। যথারীতি অকাল বর্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জয়তীর দুঃসাহস, 'বেবী'-কার ইত্যাদি প্রথম পরিচয় সুলভ আলাপ আলোচনার মধ্যে 'বেবী-কার' থেকে সুটকেশটি তুলে নেওয়া হ'ল, 'বেবী'র গায়ে হাত দিয়ে অপরিচিত ভদ্রলোক বল্লেন—আর যাই হোক আপনার বেবীর বয়স হয়েছে, নেহাৎ খোকাটি বলা চলে না।

জয়তী উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে বলল, পঞ্চাশ বছরের অনেক খোকাকে ত' দেখা যায়, এও আমার "বৃদ্ধ বেবী"। বনেট খুলে দু' একটা অংশ পরীক্ষা করে ভদ্রলোক বললেন—ম্যাগনেট নিয়েই গোল বেধেছে, এ এখন থাক, চলুন কোথায় হোটেল আছে দেখি।

জয়তী মৌন থেকে এ প্রস্তাবে সম্মতি জানাল।

ডাক-বাংলা মিলল না, অনেক অনুসন্ধানের পর একটি "প্রবাসী বাঙালী হোটেলের" সন্ধান পাওয়া গেল। মালিক স্বয়ং সপরিবারে দু'চারখানি ঘর নিয়ে বাড়িটিতে থাকেন, বাড়িতে পাঁচ ছয়খানি ঘর প্রয়োজন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাঙালীর হোটেল এই বিশেষ লেবেল আঁটা থাকায়, সুবিধা কম, দক্ষিণা বেশি। একাদনের জন্য পাশাপাশি ঘর পাওয়া গেল, হোটেলের মালিক বসুমল্লিক মশাই ব্যস্ত থাকায় তাঁর গাড়োয়ালি দারোয়ানই সব ব্যবস্থা করে দিল।

নির্দিষ্ট ঘরে ভিজে শাড়ি বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে আজকের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা ভেবে জয়তীর হাসি পেল। অদৃষ্টের পরিহাসে এমন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল, যাঁর নাম, ধাম, পরিচয় কিছুই জানা নেই, এমন কি দু' এক ঘণ্টা আগে সম্পূর্ণ অপরিচিত অজানা ব্যক্তি কিছুক্ষণের আলাপে কেমন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছেন।

দুর্ঘটনায় পড়লে কেমন সহজেই লজ্জাশীলা বঙ্গললনা প্রগল্‌ভা হ'য়ে

হয়ে উঠতে পারে আজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জয়তী তা বুঝেছে। বেশি কথা কওয়া বাচালতা—জয়তীর প্রকৃতি বিরুদ্ধ, অথচ কেমন সহজেই এই অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে সে অতি পরিচিতের মতো ব্যবহার করছে। ত্রাণকর্তাটি এখনও আত্ম পরিচয় দেন নি, তবে আলোর নিচে তাঁর সৌম্য শান্ত মূর্তি ভাল করে দেখে জয়তী বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ ছন্দ, সুঠাম দেহ, চোখে মুখে বুদ্ধি ও প্রতিভার চিহ্ন বর্তমান। আলাপে আলোচনায় এ পর্যন্ত রসজ্ঞান ও সংস্কৃতিপূর্ণ মনেরই পরিচয় পাওয়া গেছে। তবু কোথায় যেন একটু শূন্যতা বর্তমান। ব্যবহার ও ভংগীমায় প্রাণের পরিচয় দেয় অল্প, কেমন যেন নিস্পৃহ ঔদাসিন্যের লক্ষণ। এই চাঞ্চল্য ও অসহায় ভংগীমা স্বাভাবিক কিংবা পোষাকী কে জানে! তবে মনুষ্য চরিত্রে যেটুকু অভিজ্ঞতা জয়তীর আছে তা স্বাভাবিক ও কৃত্রিমের প্রভেদ বিচার করার পক্ষে যথেষ্ট।

আহার্য বস্তুর আয়োজন তেমন প্রচুর না হলেও জিনিষগুলি সুস্বাদু ও সুখাদ্য। সেই কারণেই এই ক্লান্তিকর অভিযানের পর ভোজ্য বস্তু অমৃতের মত রমণীয় মনে হ'ল।

ত্রাণকর্তা বল্‌লেন,—আমাকে আপনি পেটুকই বলুন আর যাই বলুন, আমি এ পাহাড়ি পুং দ্রৌপদীর প্রশংসা করতে বাধ্য! বহুকাল এমন চমৎকার রান্নার সঙ্গে পরিচয় নেই।

—এ কথা আমিও স্বীকার করি। গুণী লোক বটে।

ত্রাণকর্তা রিস্টওয়াচ আলোর দিকে ঘুরিয়ে সময়টা একবার দেখে নিলেন। জয়তী লক্ষ্য করলো হাতঘড়ির ডিজাইনের মধ্যে নূতনত্ব আছে। এই ভদ্রলোকের সব কিছুই প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের পরিচায়ক! গ্রে ফ্লানেলের সুট, সিল্কের সার্ট, ফুলার্জ টাই, সুএডের জুতো।

ভদ্রলোক বললেন—এদিকে কিন্তু ঘড়ি ক্রমশঃ মধ্য রাত্রির দিকে এগিয়ে চলেছে, আহার পর্ব সমাধা হ'ল, এখন আপনার 'বেবী'টার চিকিৎসার কি করা যায়।

--এখন কটা ?

—প্রায় পৌনে দশটা, গাড়ির জন্যে একটা লোককে পাঠিয়েছি।

—ধন্যবাদ ! দেখুন ত' আমি একলা কি আর সব পেরে উঠতুম। কিন্তু সত্যি অনেক রাত্রি হয়ে গেল।

ত্রাণকর্তাও বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করে জয়তীর ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করছেন। বর্ষাতিটা খুলে ফেলবার পর জয়তীর পুরুষালি ভঙ্গিমাটুকু অনেকটা কেটে গেছে, এখন তাকে রীতিমত মহিলা বললেই চলে, নারীত্বের মহিমামণ্ডিত মূর্তি জয়তীকে অপূর্ব শ্রীময়ী করে তুলেছে। মেয়েটি বেবীকারে এতদূর পাড়ি দিলেও তেমন সঙ্গতিসম্পন্ন নয়, পোষাক পরিচ্ছদ, প্রসাধন ভংগীমায় সারল্য অপেক্ষা অভাবের পরিচয় পরিস্ফুট—তবু তার স্বপ্ন মায়াময় আয়ত দু'টি চোখে যেন সাগর জলের গভীরতা বর্তমান। ভ্রু যুগ পেনসিল স্পর্শে ধনুর আঁকৃতি পায়নি, চোখের নিচে সুরমা নেই, চুলে বিলাতী মেমের লোহার ক্লিপের স্পর্শ নেই, তবু তার মুখখানি কোমল ও মধুর। করুণা ও অন্তরঙ্গতায় দু'টি চোখ পরিপূর্ণ। রাত অধিক হয়েছে শুনে মেয়েটি যেভাবে অবাক হয়ে আঙুলটা কামড়াল তা সত্য সত্যই লক্ষ্য করবার। মুখটাও যেন দুধে আলতার মত মৃদু অথচ মনোরম রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠলো, কিশোরীর রূপলাবণ্যের এই অপূর্ব বিকাশকেই ত' কবি 'অম্লিলাবণ্যপুঞ্জে' বলেছেন।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—আজই দিল্লী পৌছান দরকার ? এত রাতে এখান থেকে ছাড়লে পৌছতেও টাইম লাগবে—?

—আজই যাওয়ার যে বিশেষ প্রয়োজন তা নয়, তাছাড়া গভীর রাতে গিয়ে কারুর বাড়ির দরজা ঠেঙ্গানোর মত বর্বরতা বোধ করি আর নেই। তার চেয়ে বরং……

—ঠিক বলেছেন, তাহলে আজ এখানে থাকলেই হয়, তারপর কাল দিনের আলোয় অনেক কিছু কথা মনে জাগতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, রাতে সব কিছুর মত বুদ্ধিটাও যেন কেমন ঘুমিয়ে পড়ে—'

—আশ্চর্য কি—তবে কুড়েমি করে বুদ্ধি যদি দিবানিদ্রা অভ্যাস করে, তাহ'লে ?

ভদ্রলোক অট্টহাস্য করে উঠিলেন !

কথাটা জয়তীর মনে লাগল। ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন—এখনও সার্শিতে তুরন্ত হাওয়ায় জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে—ক্লান্তিকর পথ-ভ্রমণের চেয়ে ঘরের এই উষ্ণ আবহাওয়া অনেক মিঠে—অনেক আরামপ্রদ। এখন যদি শোবার ঘর পাওয়া যায় আর চার্জ তেমন বেশি না হয় তাহলেই মঙ্গল—নয়ত…'

জয়তীর চোখে উদ্বেগ ও আকুলতার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, ভদ্রলোক মৃদু হেসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—

এত কি আকাশ-পাতাল ভাবছেন বলুন ত'? এই চমৎকার সন্ধ্যাটি কি এমন গম্ভীর হয়ে কাটিয়ে দেবেন ?

জয়তী এতক্ষণে তার কাহিনী শোনবার সুযোগ পেল। যদিচ সে দুঃসাহসিকার মত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেচে এবং সামনে আরো দীর্ঘপথ বাকী, তবু বাইরের আকাশের মত তার মনেও যে মেঘ জমে রয়েচে এই একটি কথায় তা যেন শ্রাবণের ধারার মত ঝরে

পড়ল। অন্তরের আবেগ কিছুতেই রোধ করা যায় না, যদি এতটুকু সহানুভূতির স্পর্শ পাওয়া যায়।

জয়তীর বাবা বহুকাল আগে ডাক্তারী পাশ করে অগ্রায় এসেছিলেন, আর আমরণ সেই দেশেই ডাক্তারী করে এসেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর সংসারে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে, বড় ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গ্লাসগো গিয়েছিলেন, সম্প্রতি ব্যারিস্টার হয়ে বিদেশিনী সহধর্মিনীকে নিয়ে দেশে ফিরচেন. মেজভাই দেশ সেবক এবং বারমাসের মধ্যে তেরো মাসই সরকারের অতিথিশালার নিরাপদ আশ্রয়ে থাকেন, আর জয়তী একাই কোন রকমে এতদিন কাটিয়েছে, পুলিসের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, লেখাপড়া করেছে, আর দুর্দিনে কঠিন হাতে সংসার তরণীর হাল ধরে রেখেছে। মেজদার আদর্শে তার মনে প্রাণে উগ্র দেশ প্রেমের প্রেরণা বর্তমান, আজ আগ্রায় তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাই সে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়েছে, কোথায় যে এর শেষ তা সে জানেনা। দিল্লীতে তার দর সম্পর্কের এক দিদি আছেন, অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী, কিন্তু স্বাস্থ্য-সম্পদে নাকি সম্পূর্ণ দেউলে, অর্থাৎ প্রায়ই শয্যাশায়ী থাকেন. উপস্থিত তাঁরই আমন্ত্রণে কিছুদিনের জন্যে সেখানে যেতে হচ্ছে। এত কাছাকাছি থেকেও বিয়ের পর দিদির সঙ্গে দেখাই হয়নি, অথচ বাল্যকালে বহুদিন এক-সঙ্গে কেটেছে, তাই আহ্বান যখন এল সে ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকা গেল না।

জয়তী বল্লে—আমার দিদির কোন অভাবই নেই, সংসার চালাবার জন্যে নিশ্চয়ই আমাকে ডাকেন নি, আসল কথা একজন সংগী চান, কত কি যে লিখেছে চিঠিতে ইনিয়ে বিনিয়ে কি বলবো, ভেবেছিলুম আজ রাতেই পৌছব, কিন্তু এখন যা দাঁড়াল কালকেও

হয়ে ওঠে কি না কে জানে। গাড়িটার একটা বন্দোবস্ত করতে হবে ত'। ভদ্রলোক অসীম ধৈর্য ভরে ও বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে জয়তীর কাহিনী শুনলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—এখন দেখা যাক একটু ঘুমের ব্যবস্থা করা যায় কি না! আপনার গাড়ির একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।

ঘর পাওয়া গেল, জয়তী এমনই একটা ছোট ও পরিচ্ছন্ন ঘর মনে মনে কামনা করেছিল, সুতরাং তার সহজেই পছন্দ হয়ে গেল।

রাত ক্রমশঃই গভীর হয়ে উঠেছে, তাছাড়া জায়গাটিতে একবিন্দু প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় না—চারিদিকে কেমন একটা অখণ্ড স্তব্ধতা, বাইরে ঝড় জলের যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল তাও কিছুক্ষণ হল থেমে গেছে।

শোবার ঘরের ব্যবস্থা হলেও শোওয়া এখনও হয় নি, কারণ গল্পের আর শেষ নেই, কোথা থেকে যে এত কথা জয়তীর মনে এল কে জানে। অবলীলাক্রমে সে অনর্গল বকে চলেছে, আর সেই ভদ্রলোক, তিনি দু'চারটি প্রাসঙ্গিক কথা তুলে গল্পের গতি বাড়িয়ে চলেছেন। জয়তী বুঝচে সে প্রগলভের মত বকে চলেছে, কিন্তু আজ তার দেহ ও মনে এক অপূর্ব উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। যে জীবন এতদিন স্তব্ধ মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল, আজ তা কিসের আবেগে এমন মুখর হয়ে উঠেছে কে জানে। মুগ্ধ প্রশংসায় ভদ্রলোক বললেন—আমাদের দেশে যে সব মেয়েরা ঘরের কোণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে, সুযোগ ও সুবিধা থাকলেও এতটুকু সাহস ও শক্তির পরিচয় দেয় না, তারা যে দেশের কাছে, সমাজের কাছে, কতবড় অপরাধী তা তারা বোঝেনা। অর্থ আছে, সময় আছে শিক্ষা আছে, অথচ সেই ঘরের কোনটিতে বসে কেবল মিসেস অমুকের শাড়ি আর মিসেস তমুকের

চরিত্র নিয়ে দিনের পর দিন যে কি করে কাটিয়ে দেয় তা ভাবা যায় না। নিতান্ত স্বার্থপরের মত এই আত্ম-কেন্দ্রিক সমাজ যে কি ভাবে চলেছে তা বলে বোঝান শক্ত, অথচ আপনি এত অল্প বয়সে এত কিছু দেখেছেন, এত কিছু সংকট ও সমস্যার মুখে পড়েছেন তবু যে এই ভাবে একা নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়েছেন, এতে শুধু দুঃসাহস নয় আপনার দৃঢ়তারও পরিচয় পাই। একটা ছোট বেবী কারে আগ্রা থেকে দিল্লী চলেছেন, অথচ এমন মেয়েদের জানি যাঁরা এ পাড়া থেকে ওপাড়াটুকু 'সোফার হীন' অবস্থায় যেতে অপমান জ্ঞান করেন, এমনই তাঁদের অহমিকা, দম্ভ।

জয়তী বললে—এ আপনার বাড়াবাড়ি, অকারণ ক্রোধ! আমি যে অবস্থা ও অশান্তির ফলে এই দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়েছি, সেই অবস্থায় পড়লে তাঁরাও হয়তো এই পথই নিতেন। আপনি বড় সিনিক্।

হয়ত তাই, কিংবা আপনার সঙ্গে দেখা হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাই ছিলুম, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে আমার ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল বুঝতে পারছি না।

এই কথায় জয়তীর মুখের রঙ লজ্জায় অত্যন্ত লাল হয়ে উঠ্‌ল, তার এই লাজ রক্তিম মুখখানির একপাশে আলো পড়ায় ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। এই ব্রীড়াকুণ্ঠ ভঙ্গীটুকুতে মোহিত হয়ে ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠ্‌লেন—দীর্ঘকাল আপনার মত কাউকে দেখিনি —দীর্ঘকাল কেন সারাজীবনেও ঠিক এমন কারুর সংস্পর্শে এসেচি বলে মনে পড়ে না। আমার জীবনটা নষ্টই করে ফেলেচি, কোন কাজই নেই, সময় ও অর্থ আছে, সেই অর্থ ও সময় চিরদিন অকারণ আনন্দের পিছনেই ব্যয় করে চলেছি।

—অকারণের আনন্দে দিন কাটান সেই বা মন্দ কি,—জয়ন্তী মৃদু হেসে বললে।

—আপনি নিশ্চয়ই তা পছন্দ করেন না, এ ধরণের জীবন যাপন করা অন্ততঃ আপনার যে মনঃপূত হবে না তা আমি জানি। কিছু না কিছু কাজ আপনি চান, এ আমি বুঝি।

জয়ন্তী এ কথায় কোন উত্তর না দিয়ে দু'হাত দিয়ে মাথার অসংবৃত চুলগুলি সরিয়ে ঠিক করে নিলে—এতক্ষণে চুলগুলি কতকটা শুখিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে জয়ন্তী বললে—কাজ অবশ্য কিছু করলেই ভালো, তা বলে বেশি টাকা থাকাটা অপরাধ বলে গণ্য করবো না। টাকা থাকলেও অনেক কাজ করার আছে।

—একথার উত্তর দিতে হলে বলবো—

"জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
জনাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি।"

সবই জানি কিন্তু কিছুই যে করা আর হয়ে উঠে না। আপনি এ অবস্থায় পড়লে হয়তো কত কি করতেন।

—হঠাৎ একথা কেন আপনার মনে হ'ল ?

—ঠিক জানিনা, তবে এটুকু বুঝতে পারছি আপনি হয়তো সুযোগ ও সুবিধা পেলে তার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করতেন। সত্যি কথা কি জানেন, আপনাকে আমার খাঁটি লোক বলে বিশ্বাস হয়েছে, অনেকের সংস্পর্শেই ত' এসেছি এ সংসারে আসল নকল বিচার করা শক্ত।

এইভাবে আরো কিছুকাল বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা চলবার পর জয়ন্তী সহসা বলে উঠল, কি আশ্চর্য! এতক্ষণ আমরা একসঙ্গে রয়েছি, এত ঘনিষ্ট বিষয়ের আলোচনা হ'ল অথচ উভয়েই উভয়ের কাছে অপরিচিত রয়ে গেছি—কেউ কারুর নামও জানিনা।

ত্রাণকর্তা ভদ্রলোকটি নিঃশেষিত প্রায় সিগ্রেট্‌টি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উদাসীনের মতো ভংগীতে জয়তীর সরলতা পূর্ণ সুন্দর মুখখানির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লেন—আমার নাম কিন্তু বলবোনা, কিছু বাধা আছে, মিথ্যে যা হয় একটা বানিয়ে বলতে হয়ত পারতাম, কিন্তু আপনার কাছে মিথ্যা বল্‌তে বাধে। 'পৃথিবীর আর একজন অলস এবং ধনী-যুবক' এই পরিচয়টুকুই আপনার জানা থাক। আপনার কাছে একথা বল্‌তে মনে মনে লজ্জিত হচ্ছি, কিন্তু অপরিচয়ের অন্ধকারে যেটুকু পেয়েছি সেইটুকু আমার চিরদিনের সম্বল হ'য়ে থাক, অন্তরঙ্গতার আলোয় তা হারাতে চাইনা। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমার আছে আপনার কাছে, এইভাবে নিরুদ্দেশের পথে ঘুরে ঘুরেই কি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন স্থির করেছেন? যে-পাখী আকাশের অংগনে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, সেওত' সন্ধ্যায় নীড়ে ফিরে আসে। প্রশ্নটা হয়ত ভালো শোনাবে না, এই ঘনিষ্ঠ প্রশ্নটুকু না করলেই ভালো হ'ত, তবু কৌতুহল হচ্চে বলেই জানতে চাই ঘরে ফিরে যাবার বাসনা কি একেবারেই ত্যাগ করেছেন?

জয়তীর মুখখানি ব্যথা ও বেদনায় সহসা পাংশু হ'য়ে উঠেছে, সে অতিকষ্টে বল্লে—ঘর ছাড়িনি, আর ঘরে ফিরবো কিনা তাও জানিনা।

—আর ঘর বাঁধবার বাসনা নেই? কেউ আপন জন নেই? যাকে নিয়ে জীবনটাকে আপন ছন্দে বাঁধ্‌তে পারেন?

জয়তীর পাংশু পাণ্ডুর মুখখানি এই কথায় রক্তিম হ'য়ে উঠলো—সে শুধু দৃঢ়কণ্ঠে জানালো—না!

—কিন্তু যেদিন সেই চরম মুহূর্ত আপনার জীবনে আসবে, সেই দিনই জীবনের মূল্য বুঝবেন, মন দেওয়া নেয়ার সেই খেলাতেই

অন্তরের দেবতার আবির্ভাব হবে। প্রেম আপনার কাছে ছদ্মবেশ ধরা দেবেনা।

—পরিচয় জানতে চেয়েছিলাম, এত সব অবান্তর কথা কেন বলছেন ?

—অবান্তর তা বুঝি, কেন যে বলছি নিজেই জানিনা।

যে-সারল্যের মাধুর্যে ভদ্রলোক মুগ্ধ সেই নিস্পৃহ সারল্যের সঙ্গে জয়তী বল্লে—আপনার কথাগুলি মিঠে, কাব্য-চর্চা ক'রে থাকেন বলে সন্দেহ হয়।

সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে ভদ্রলোক তেমনই ধীর কণ্ঠে বললেন দেখুন, নিজের নাম যখন বলছিনা তখন আপনার নাম'ত জানতে চাওয়ার অধিকার নেই, তবু আপত্তি যদি না থাকে ত' আপনার ডাক নামটা বলুন—

জয়তী মৃদু কণ্ঠে বললে—জয়া, আর আপনার ডাক নাম ?

চমৎকার নাম ত, সেকেলে আমেজ থাকলেও নামটি ভালো, আপনিও কি সেকেলে নাকি ?

—জয়তীর গলার স্বর শুকিয়ে গেল, এমন একটি আশ্চর্য লোকের সংস্পর্শে সে জীবনে আসেনি কিংবা কোনদিন কল্পনাও করেনি। লোকটির কথা বলার ভংগীটুকুও মনোহর। এই মধুর প্রশংসাবাণী নিছক চাটুকারতা হলেও মধুর শোনাচ্ছে। নিজের বুকের স্পন্দন ধ্বনি জয়তীর কানে ইঞ্জিনের আওয়াজের মত শোনালো। কিছুক্ষণ পরে সে বললে…এ-কালিনী হয়েও সে-কালিনী সাজার মধ্যে হয়ত, কিঞ্চিৎ গরিমা আছে, কিন্তু সে গর্ব আমার নেই, আমি দু'কালের মধ্যে একটা সমন্বয় করে নিয়েছি। কিন্তু আমাকে হঠাৎ আপনার সেকেলে বলে মনে হল কেন ?

—এইত জীবনের এতখানি পথ একলাই কাটিয়ে এসেছেন, মনের মণিকোঠায় কড়া পাহারা বসিয়ে রেখেছেন, এসব ত' এ-কালিনী মেয়ের চিহ্ন নয়—একালে ত' প্রেমে না পড়াটাই আশ্চর্য—'

অত্যন্ত সলজ্জ ভঙ্গিতে জয়তী বললে—দুঃসাহসিকা বলে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, কিছুই গোপন করবো না—তবে জীবনের কাহিনী আমার সামান্য। বাবা যখন ছিলেন তখন তাঁর এক এ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট আমাকে নিয়মিতভাবে চিঠি পাঠাতেন, ভালোও লাগতো বেশ, কিন্তু অবশেষে—'

—অবশেষে কি ?

—অবশেষে তিনি অভদ্রের মত একদিন আমাকে চুমু খেয়ে বসলেন—'

ভদ্রলোক অট্টহাস্য করে উঠলেন—আর তারপরই আপনি তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করলেন ত' ?

—নিশ্চয়, কি অভদ্র বলুন ত'।

—সেই থেকেই মনের মণিকোঠায় চাবি পড়ল ! এ ভারি হাসির কথা।

অপ্রতিভ ভঙ্গীতে শাড়ির আঁচলে আঙুল জড়াতে জড়াতে জয়তী বললে—লোকে বলে মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে মেশবার উপযুক্ত হয়নি, কিন্তু ছেলেরাই কি উপযুক্ত আপনিই বলুন ?

ভদ্রলোক বললেন, আজকের এই রাতে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে আমাদের দেখা হয়েছে, আগামীকাল হয়ত উভয়েই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাব, তাই আমার নাম আপনাকে বলিনি। কিন্তু আপনার ডাক নাম যখন শুনেছি তখন আপনাকে একটু কিছু বলি। ছোট-বেলায় মা আমাকে 'টুটুল' বলে ডাকতেন, তিনি চলে যাবার পর

তাঁর সঙ্গে নামটিও চলে গেছে, ও নামে কেউ আর আমায় ডাকে না। আমার সেই বিস্মৃত নামটি আপনাকে জানালুম। এই আমার সব চেয়ে বড় পরিচয়।

—একে জয়ার মত সেকেলে বলতে পারি না, বেশ নতুন ধরণের নাম, জয়তী বললে।

—নতুন আর পুরোনো, জয়া আর টুটুল দুই-ই হয়ত সেকেলে, বিধাতার চক্রান্তের কতটুকুই বা আমরা বুঝি!

এই পর্যন্ত বলে 'টুটুল' উঠে দাঁড়ালো। দীর্ঘাঙ্গ-সুঠাম দেহখানি ঘরের সেই ম্লান আলোকেও অগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। কিন্তু কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে, একটা নিদারুণ শূন্যতা—'টুটুল' বাবুর এই বিষণ্ণ উদাসীন মুখভঙ্গিটুকুই তাঁর সৌন্দর্যকে আরো ফুটিয়ে তুলেছে।

সহসা জয়তীর মনে হ'ল এই যে প্রাণীটি তাঁর আসল নাম, ধাম, পরিচয় গোপন রেখে 'টুটুল' নামে পরিচিত হলেন, সমাজের নিতান্ত নগণ্য সাধারণ জীব বলে সবিনয়ে আত্ম-পরিচয় দিলেন—তিনি আর জয়তী একান্ত একা। এ সে কি করেছে, সম্পূর্ণ অপরিচিত ভদ্র-লোকটির সঙ্গে নিতান্ত পরিচিতের মত ব্যবহার করেছে। সুখ আর দুঃখ নিয়ে উভয়ের জীবনের বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে অন্তরঙ্গের মত আলাপ করেছে—আজ এইভাবে এখানে তাঁর সঙ্গে চলে এসে সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়েছে কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। বিপদ কালে মাথার কোনও ঠিক থাকেনা, নতুবা সেই বা কি করে এই সম্পূর্ণ অপরিচিতের সঙ্গে চলে এল—তারপর এভাবে একত্রে রাত্রিবাস! কিন্তু ভয়েরই বা কি আছে, জয়তী মানুষকে ভয় করে না। টুটুলবাবু এমন কিছু বলেননি বা তাঁর ব্যবহারে এমন কিছু প্রকাশ পায়নি যে

তাঁকে অবিশ্বাস করা চলে—আর নিজের সম্বন্ধে জয়ন্তীর এতটুকু অবিশ্বাস নেই। হিংস্র পুলিশী জেরার মধ্যে ভয়াবহ হাজতেও ত' তাকে কিছুকাল কাটাতে হয়েছে—অপরাধ কি, না তার কাছে "নিষিদ্ধ ইস্তাহার" ছিল। আর যাই হোক ঐ ভদ্রলোক ত' আর পুলিশ নয়! বিগত দু'বছরের মধ্যে বাইরের জগতের সংস্পর্শে জয়ন্তীকে বিশেষ-ভাবে আসতে হয়েছে, ঘনিষ্ঠভাবে অনেক কিছু দেখতে হয়েচে, জানতে হয়েচে, তার ফলে আর যাই হোক ব্যবহারিক জগতের পরিচয় পাওয়া গেছে, সে জগতে যে তীব্র বোধ শক্তি ও রসবোধের প্রয়োজন তা জয়ন্তীর আছে। এই বিশেষ বয়সে তরুণী-মেয়ের সদা সর্বদাই যে সংকট জালে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা, সেই সংকটময় মুহূর্ত থেকে ত্রাণ পাবার শক্তি ও সাহস জয়ন্তীর আছে।

কিছুকাল ধরে একা একাই জীবনটা কাটিয়ে দেবার বাসনা ছিল জয়ন্তীর—নিঃসঙ্গ জীবন ও কর্মপদ্ধতি তার জীবনের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সম্প্রতি সেই নিঃসঙ্গ জীবনের নৈঃশব্দ্য যেন বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু আজ এই অপরিচিত লোকটির সঙ্গে আলাপ করে তার মনের মেঘ কেটে গেছে। এটা সে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছে যে, মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে বড় কথা ভালবাসা দেওয়া আর ভালবাসা পাওয়া। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি জীবনের এই মূলতথ্য সম্বন্ধে সজাগ করলেন—এই বড় বিচিত্র কথা। কিন্তু টুটুলবাবু সেই অসম্ভবই সম্ভব করেছেন।

আকস্মিক ভীতি বিহ্বলতায় জয়ন্তীর আগামী কালের কথা মনে পড়ল—মনে পড়ল তার দূর সম্পর্কের বোন সানন্দার কথা—তার অতুল ঐশ্বর্যের ইন্দ্রপুরীতে রাজেন্দ্রাণী হয়ে সে বসে আছে, সমাজ সংসার সব কিছুরই মূল্য নেই তার কাছে—সে জানে ব্যবসা আর

বিলাসিতা। দিল্লীতে যে কি ভাবে দিন কাটবে কে জানে! দিল্লীর পথে যখন সে পাড়ি দিয়েছিল তখন একথা ভাবেনি—কিন্তু এখন টুটুলবাবু ঠিকই বলেছেন—ঘরের ঘরণী হওয়া কার জীবনের কাম্য নয়? জীবনটাকে নতুন ছন্দে বাঁধবার বাসনা কার নেই? জীবনের এক বিশেষ মুহূর্তে এই মন দেয়া-নেয়া খেলাই ত' জীবনের সবচেয়ে বড় খেলা। স্বামী চাই, পুত্র চাই, একথা সে যুগের আদর্শ ছিল বলে এ যুগে উপেক্ষা করা চলে না—চাই সবই, অথচ আধুনিক কালে সকল ব্যাপারেই একটা উপেক্ষা মিশ্রিত, তাচ্ছিল্যের ভ্রুকুটি বর্তমান।

কিন্তু এই টুটুলবাবুটিই বা কে? কোথায় যাবেন, কোথা থেকে আসছেন, সবই রহস্যের কুজ্ঝটিকায় জড়িয়ে আছে, বিবাহিত কি অবিবাহিত—হয়ত বিবাহিত নয়। কিন্তু কি বিড়ম্বনা! জীবনে যার সঙ্গে হয়ত আর কখনো দেখা হবে না তার সম্বন্ধেই বা কেন এত অকারণ চিন্তা।

চোখের চশমাটি মুছ্‌তে মুছ্‌তে জয়ন্তীর দিকে সরে টুটুল বাবু বললেন—সকলেই হয়ত ঘুমিয়ে পড়লো, আপনিও হয়ত ক্লান্ত।

বিশ্রান্ত ভঙ্গিতে হাই তুলে জয়ন্তী বললে—হ্যাঁ, এইবার ভাব্‌ছি আমিও ঘুমুবো।

'টুটুল' তৎক্ষণাৎ বললো—না জয়া তুমি এখনই ঘুমিয়োনা, আমার জীবনের এক পরম মুহূর্তে তোমার আবির্ভাব হয়েছে, আমার মনের অনেকখানি ভার নেমে গেছে। তুমি জানো জয়া, আজ সর্বপ্রথম আমার মনে হ'ল আমিও এই 'বিরাট কার খানি' ভেঙ্গে ফেলে তোমার ঐ বেবীর মত একখানি গাড়ি নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিই—সে গাড়িতে কেবল তুমি আর আমি—কেবল অকারণে পথ চলা—কেউ জানবেনা কোথায় কি উদ্দেশ্যে ভেসে চলেছি। যদি তোমাকে

২৯০৭

আমি সেই তীর্থপথে যাবার সময় আমন্ত্রণ করি,—আসবে—পারবে তুমি ?

এই আকস্মিক আবেগ ও উচ্ছ্বাসের কি উত্তর জয়ন্তী দিতে পারে সে কোনও উত্তর দিল না, একি বাতুলের প্রলাপ! মনোরম, কিন্তু ব্যবহারিক জগতে এর মূল্য কি ?

জয়ন্তীর চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠ্‌লো, কণ্ঠ আবেগে অবরুদ্ধ—কি এক অজ্ঞাত শক্তি তার কণ্ঠ অবরুদ্ধ করে রেখেছে! সহসা জয়ন্তী বলে উঠ্‌ল—আমার জীবনে এভাবে কাউকেই আমি পাইনি টুটুল। আবার আমাকে ঐ নামে ডাকো।

তারপর—বিস্ময় বিহ্বল জয়ন্তী ব্যাপারটা যে ঠিক কি তা বুঝবার পূর্বেই টুটুল অকস্মাৎ তাকে নিবিড় বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করলো।

সারাদিন ধরে বিভিন্ন রোগী ও বিচিত্র রোগের তদারক করে বাড়ি ফিরে ডাঃ মৈত্র যে জরুরি টেলিগ্রামখানি পেলেন তা মোটেই শুভ-সংবাদ বহন করে আনেনি। ছোট ভাগ্নেটি হঠাৎ পড়ে গিয়ে হাত ভেঙেছে। অবস্থা সংকটজনক, তাই ভগ্নিপতি ভাদুড়ি মশাই ব্যাকুল হয়ে টেলিগ্রাম করেছেন।

ছেলেটি ডাঃ মৈত্রেরও বড় আদরের, তাই ক্লান্ত শরীর ও অবসন্ন দেহ নিয়েও এই জল ঝড়ের মধ্যে তখনই মোটর নিয়ে ছুটতে হ'ল। জায়গাটা কাছাকাছি হলেও নেহাৎ কাছে নয়, ভাদুড়ি মশাই এই জায়গাটিই শেষকালে ব্যবসার পক্ষে যোগ্য মনে করে বেছে নিয়েছেন। তার এ আহ্বান উপেক্ষা করা চলেনা।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটি তেমন কিছু গুরুতর

নয়। হাড় ভাঙেনি, তবে আঘাতটা বেশি আর যন্ত্রণাদায়ক, ভয়ে জ্বর এসেছে।

ভাদুড়ী মশাই সব শুনে আশ্বস্ত হয়ে বললেন—বাঁচালে ভাই, বাঁচালে। তোমার বোনটি কেঁদেই আকুল, আর মণ্টুটাই বা কি কম, ভারী ভীতু অথচ দুষ্টুমি করতেও ছাড়ে না, মিছিমিছি তোমাকে এই জল ঝড়ের মধ্যে এতখানি দৌড়ে আসতে হ'ল।

অপর পক্ষ অর্থাৎ ভাদুড়ী গৃহিণী ঝঙ্কার করে বলে উঠলেন—কি করি বলো। এমন দেশে এসে উঠেছ যেখানে না আছে ডাক্তার, না আছে অন্য কিছু—কি রকম ভয় দেখিয়ে দিলে ভাই। বললে এক্স রে করতে হবে, কম্পাউণ্ড ফ্র্যাক্‌চার, একটা এ্যান্টি-টিটেনাস ইন্‌জেক্‌সান দিতে হবে, অমুক তমুক, সাত সতেরো, সে এক এত বড় লিস্টি—এখন তবু একটু ভরসা হোল—

ভাদুড়ী মশাই টিটকিরি দিয়ে বললেন—বলিহারী তোমাদের সাহস, হতেও যতক্ষণ, যেতেও ততক্ষণ। আমি ত' তখনই বলেছিলুম ভয়ের কারণ নেই—

—হ্যাঁ তাই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করেছিলে, এমন নার্ভাস লোক যদি দু'টি আছে।

ডাঃ মৈত্র হেসে বললেন—যাক্ বাপু, তোমাদের এ দাম্পত্য কলহের মধ্যে আমি আর কেন, এখন আমার ফিটা এলেই যে উঠ্‌তে পারি—'

ভাদুড়ী মশাই আবার চীৎকার করে উঠ্‌লেন—ঐ দেখ ছিঃ ছিঃ তোমারই বা কি আক্কেল—বেশ বসে আছ। কই রে বাহাদুর, চা পাঠাতে যে বুড়ো হয়ে গেলি বাবা—'

ভাদুড়ী গৃহিণী বললেন—থাক্ তোমাকে আর চেঁচিয়ে লোক জড়ো

করাতে হবেনা, সে ব্যবস্থা আমি করেছি—কিন্তু ভাই রাতটা এখানে থেকে গেলেই হ'ত।

ডাঃ মৈত্র হেসে বললেন—তোমাদের এই কলহের জ্বালায় শেষে সন্ন্যাসী হব। থাকবার উপায় যে নেই—

ভাদুড়ী মশাই অট্টহাস্য করে উঠলেন—সন্ন্যাসী হতে আর বাকি কি, তোমার মত বয়সে আমাকে বড়খুকীর বিয়ের ভাবনা ভাবতে হয়েছে। বিয়ে থা করে সংসারী হওয়া দেখ্‌ছি তোমার কপালে নেই। তবে এক রকম ভালো, বিয়ে হ'লেই হাজার জ্বালা—আজ গয়নার ফ্যাসান পাল্টাও, কাল সিনেমা, পরশু শাড়ি—

গৃহিণী আবার বাধা দিলেন—হ্যাঁ দিনরাত্ত তোমাকে গয়নার জন্য জ্বালাতন করছি। রোজ সিনেমায় যাচ্ছি—'

আবার এক প্রস্থ কলহের সূচনা হচ্ছিল, কিন্তু চা এবং জলখাবার হস্তে বাহাদুর ঘরে প্রবেশ করায় এ-প্রসঙ্গে বাধা পড়লো।

জলযোগের পর তেতলার সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে নাম্‌তে ভাদুড়ী মশাই আর একবার বললেন—এমন ভয় পেয়েছিলুম, এত সামান্য ব্যাপার জান্‌লে কখনই তোমাকে কষ্ট দিতুম না—

ডাঃ মৈত্র প্রতিবাদ করে বললেন—কষ্ট আর কি, তবে এখানকার ডাক্তারদের আক্কেল দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি, না জেনে শুনে এমন ভয় পাইয়ে দেয়। কোথায় সাহস দেবে, না মিছিমিছি একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করে। আমি আবার দু'তিন দিনের ভেতর আর একবার আসবো, কেমন।

ভাদুড়ী মশাই বললেন—এত রাত্তিরে এতখানি পথ যাবে—এক বিন্দু ইচ্ছে ছিলনা তোমাকে ছেড়ে দিই—

ডাঃ মৈত্র হাই তুলে হাতঘড়িটা দেখে বললেন—ইস্‌ সু' এখানে

হ'ল, বাড়ি পৌঁছতে অর্ধেক রাতই কেটে যাবে দেখছি। কি করি, হাতে কতকগুলো শক্ত কেস্ রয়েছে—

এমন সময় সহসা সিঁড়ির সাম্‌নের দোতালার ঘরখানির ভিতর ডাঃ মৈত্রের নজর পড়্‌ল—দরজার পর্দাটার কিছু অংশ সরে গেছে, ফলে ঘরের ভিতরের অনেকটাই এখান থেকে নজরে পড়ে—

ঘরের ভিতরের উজ্জ্বল আলোয় দু'টি নর-নারীর আলিঙ্গনাবদ্ধ মূর্তি দেখা যাচ্ছে, জগৎ-সংসার বিস্মৃত হ'য়ে দু'টি প্রাণী নিবিড় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ।

এখান থেকে নারী মূর্তির আকৃতি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সুশ্রী সুন্দরী তরুণী, চমৎকার চুলগুলিতে আলোছায়ার খেলা চলেছে। আর পুরুষটিকে এখান থেকে স্পষ্ট দেখা না গেলেও, তাঁর সুঠাম দীর্ঘাকৃতি-দেহখানিতে বহিরঙ্গের আভাষ পাওয়া যায়। মেয়েটি কিন্তু অপূর্ব—ডাঃ মৈত্র মুগ্ধ হয়ে গেলেন, মেয়েটিকে তাঁর ভালো লেগেছে। পুরুষটিকে ঠিক বোঝা গেলনা বটে, তবে আকৃতিতে আভিজাত্যের ছাপ আছে। ডাঃ মৈত্র চলেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু সহসা এমন একটি পরিচিত ব্যক্তির কথা মনে পড়্‌ল যে তাঁর গতি স্তব্ধ হ'ল, ভালো করে ব্যাপারটি দেখ্‌তে এবং বুঝতে হ'ল। এ ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই তিনি পূর্বে দেখেছেন, নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি ডাঃ মৈত্রের কোনও পরিচিত—বিশেষ পরিচিত বন্ধু হতে পারেন। কি আশ্চর্য! মুখখানি দেখা যাচ্ছেনা বটে, কিন্তু এই পোষাক পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে যে অতি-পরিচিত-প্রাণীটি লুকিয়ে আছে, তাঁকে এবার স্পষ্টই চেনা গেল।—ডাঃ মৈত্র ভ্রু কুঞ্চিত করে ভাদুড়ী মশাই-এর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—এঁরা কারা?

এতক্ষণ তাঁরা প্রায় দরজার সামনেই এসে পড়েছিল।

ভাদুড়ীমশাই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ডাঃ মৈত্রের দিকে চেয়ে বললেন—ঠিক যে কে, তা আমিই জানিনা, তবে কি জানো ভায়া, এসব সম্পর্কে কম কথা বলাই ভালো, আজকাল ত' এমনই চলেছে আখ্‌চার। সন্ধ্যার কিছু পরে এক প্রকাণ্ড গাড়ি করে এসে হাজির, রাত্তিরটা এখানে থাক্‌বেন। ও আর বোলোনা, কি যে হচ্চে দিন দিন—

—কালো রঙের গাড়ি, খুব বড়—?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি কি করে জান্‌লে? চেন নাকি এঁদের?

ডাঃ মৈত্র মৃদু হেসে বললেন—ভদ্রলোকটি আমারই পেসেণ্ট। ভাল লোক বলেই ত' জানতুম, তবে সত্যিকথা আজকাল মনুষ্য চরিত্র বোঝা ভার। বন্ধু বান্ধবের মনের কথা জানা শক্ত।

কে ভাই ইনি? মেয়েটিই বা কে? ওটিও তোমার পরিচিত নাকি?

ডাঃ মৈত্র অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন, যাই হোক, আর যে যাই করুক, তাঁর কি, এ ত' আর তাঁর ব্যবসার অন্তর্গত নয়। কিন্তু ভাদুড়ী মশাই যে রকম কৌতূহলী হ'য়ে উঠেছেন তাতে কিছু না বলাও চলেনা। ডাঃ মৈত্র শুখ্‌নো গলায় বললেন—ভদ্রলোকটি আমার বিশেষ পরিচিত, দিল্লীতে আমরা কাছাকাছি থাকি, কিন্তু মেয়েটি যে কে তা ঠিক বোঝা গেলনা। আর কিছু প্রশ্ন করবেন না, 'professional etiquette' জানেন তো?

বাহাদুরের হাত থেকে ওয়াটারপ্রুফ আর টুপিটা নিয়ে ডাঃ মৈত্র তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন।

এদিকে সেই ঘরটিতে জয়তী ও টুটুল চেতনাহীন আনন্দ প্রবাহে আত্মহারা হয়ে আছে।

টুটুলের বাহুবন্ধনের উষ্ণ আবেষ্টনে আর প্রথম প্রেমের চুম্বন স্পর্শে জয়ন্তী সব ভুলে গেল—এমন নিবিড়, এমন গভীর ভাবে আর কারুর সংস্পর্শে সে আসেনি। জীবনে দু'একবার অত্যন্ত অসময়ে এমন এক মুহূর্তের সম্মুখীন হতে হ'য়েচে বটে, কিন্তু তা মোটেই রমণীয় নয়—প্রতিবাদ ও বিতৃষ্ণার মধ্যেই তার অবসান ঘটেচে। একদিনের এই আকস্মিক ঘটনার মধ্যে প্রভেদ আছে, এ এক অপূর্ব মাদকতা, জীবনের এক অনাস্বাদিত মাধুর্যরসে আজ সারা দেহ মন পুলকিত হয়ে উঠেচে, স্নায়ু-শিরায় কি রোমাঞ্চকর আবেশ! এই ভীরু আত্মসমর্পণের মধ্যে তার সেই ছোট পৃথিবী কোথায় হারিয়ে গেছে, অন্তরের আর সব অনুভূতি অবলুপ্ত!

প্রেম! ভালোবাসা—এই প্রেম? এর নাম ভালোবাসা? এ কি উন্মত্ততা! যাকে চিনি না, জানি না, সেই সহসা, পরমাত্মীয় হয়ে আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তা করলো, সেই জীবনের মধ্যে এক এবং একমেবাদ্বিতীয়ং হয়ে উঠলো, কে এই অপরিচিত বন্ধু—যে প্রাণের মধ্যে এমনই এক আকুলতা সৃষ্টি করে মূক জয়ন্তীকে মুখর করে তুললো—মুখে ভাষা দিল—উন্মত্ত আবেগে মনকে সচকিত করে জানালো—

"—এ সেই! এই আমার জীবনের রাজপুত্র! এরই সন্ধানে ত' আমি ঘর ছেড়েছি, স্বপন লোকের সেই অধরা আজ ধরা দিয়েচে। বিরাট বিশ্বের মধ্যে সেই প্রণীটিই আজ বাহুবন্ধনে ধরা পড়েচে!"

এই দীর্ঘ প্রলম্বিত চুম্বন,—এই অবিস্মরণীয় মুহূর্ত, সেই রাজপুত্রের আগমন ঘোষণা করল। আজ আর জয়ন্তীর কাউকে ভয় নেই, সে নিজেকেও ভয় করে না,—জয়ন্তীর মনে হ'ল টুটুলের বুকের ভিতর

কান পেতে তার হৃদয় সমুদ্রের অশান্ত কল্লোলধ্বনি শোনা, আরো নিবিড় করে তার কণ্ঠলগ্ন হওয়াই সংসারের একমাত্র প্রাকৃতিক ধর্ম। তাই যখন আবেগাপ্লুত কণ্ঠে টুটুল বললে—জয়া, আমাকে তুমি ভালোবাস ?

নিজের অজ্ঞাতসারেই জয়তী মৃদু গলায় বললো—হ্যাঁ বাসি।

উন্মত্ততা আর কাকে বলে, যেমন বাতুলের মত প্রশ্ন, তার উত্তরও তেমনি, পরস্পর পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত,—অথচ এই মনোবিনিময়ের কালে সে কথা উভয়েই রইল ভুলে।

কিন্তু জয়তীর সহজাত নারী প্রকৃতি আবার এই ভালোবাসার কথাই প্রশ্ন করল। আর টুটুল শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে জয়তীর কাছে আত্ম-নিবেদন করলো। তার সেই কণ্ঠস্বরের মধ্যে আন্তরিকতার যে সুর ছিল তা' জয়তীর মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করলো।

কিন্তু কথাগুলি মুখ থেকে বেরোবার পরই সহসা টুটুলের মনে আর একখানি মুখের ছায়া পড়লো, এই একমাত্র কারণেই জয়তী কেন—পৃথিবীর আর কোনও মেয়েকেই প্রেম নিবেদন করার এতটুকু অধিকার তার নেই।

টুটুল আজ একান্ত অসহায়—তার দৃষ্টিতে ব্যথা ও বেদনার ছায়া নেমেছে, ধীরে ধীরে বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে এল, জয়তী এতক্ষণে আপনাকে বলিষ্ঠ বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে তার অনন্ত জিজ্ঞাসাভরা চোখের আত্মময় দৃষ্টি নিয়ে টুটুলের মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, টুটুল কিন্তু আর তাকে স্পর্শ করল না।

কিছুক্ষণ পরে অতিকষ্টে জয়তী বলে—ছিঃ ছিঃ কি বিশ্রী কাণ্ডই না হ'ল, আমার বাধা দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু এতক্ষণ যেন আমি অচৈতন্য হয়েছিলুম বাধা দেবার শক্তি আমার ছিল না!

জয়ন্তীর এই মধুর সরলতা টুটুলের ভারী ভালো লাগল। মৃদুকণ্ঠে টুটুল বল্লে—সত্যি, তুমি অদ্ভুত!

—ভারী বিশ্রী কিন্তু!

—বিশ্রী কেন?

—বিশ্রী যদি না হয় তাহলে বলবো নিছক পাগলামি!

—পাগলামি বলতে পারো, কিন্তু তুমি কি রাগ করেছ জয়া?

জয়ন্তী দুটি হাতের মধ্যে নিজের মুখখানি রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। উত্তাপ ও উত্তেজনায় গাল দুটি তখনও রক্তিম। এমনভাবে আত্মবিস্মৃত উন্মাদনার মধ্যে সে যে ডুবে যেতে পারে তা' সে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। এখনই, এই মুহূর্তে এই ঘর ছেড়ে, এই লোকটির দৃষ্টি ও জীবনের বাইরে চলে যেতে পারে, কিন্তু তা' হবার নয়—যার কাছে সে আজ সহসা আত্ম-নিবেদন করে দিয়েছে, কি করে তার কাছ থেকে দূরে চলে যাবে। অদৃষ্টবাদে জয়ন্তীর অবিশ্বাস আছে, তবু তার মনে হ'ল এই ব্যাপারের ভিতর কোথায় যেন অদৃষ্টের অ-দৃষ্ট হস্ত বর্তমান। যে-আকস্মিক ঘটনাচক্রে এই পরিচয় ঘটেচে ও যে গভীর আবেগে সে এই বাহুবন্ধনে নিজেকে ধরা দিয়েছে, তা' নিঃসন্দেহে অদৃষ্টের চক্রান্ত।

জয়ন্তী ক্ষীণকণ্ঠে বল্লে—না রাগ কি! রাগ করিনি ত'!

এই একটি কথাতেই টুটুলের মুখের বিষণ্ণ গাম্ভীর্য দূর হ'ল আবার সেই স্নিগ্ধ সৌন্দর্যগরিমায় সারা মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। জয়ন্তীর কাছে তার কৃতজ্ঞতার আর সীমা নাই, জীবনের এক নতুন গতিভঙ্গির সন্ধান মিলেছে। এই মধুর সন্ধ্যাটির এই অপূর্ব পরিবেশ জয়ন্তীর মুখের সামান্য একটি কথাতেই বিষিয়ে উঠতে পারত, কিন্তু জয়ন্তী তা' হতে দেয়নি। চমৎকার মেয়ে—অসভ্য নয়, অভব্যতা নেই, এতটুকু

সংকীর্ণতা নেই,—অকারণ ব্রীড়াকুণ্ঠায় অন্তরের সারল্যটুকু নষ্ট হয়নি।

এই আকস্মিক নর্মাচারকে জয়ন্তী যে সারল্য ও ঔদার্যভরে গ্রহণ করেছে তার তুলনা নেই। এই সারল্যের গুণেই সে সবাইকে অতিক্রম করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে—এই 'বীতরাগ ভয় ক্রোধ' ভাব এইটুকু টুটুলের কাছে সপ্রশংস সমাদর লাভ করেছে টুটুলের আহ্বানে জয়ন্তী যেভাবে সাড়া দিয়েছে তা লঘু কামনার সাময়িক প্রবৃত্তির বশে নয়, গভীর অনুভূতি ও আন্তরিকতার স্পর্শে-রঞ্জিত হৃদয়-বৃত্তির এক অপরূপ অভিব্যক্তি। সাধারণতঃ জয়ন্তীর সমবয়সী মেয়েদের চরিত্রে যে-লঘু চপলতার পরিচয় পাওয়া যায়, জয়ন্তীর প্রকৃতিতে তার চিহ্ন নেই, কোনও উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধিবশে আজ জয়ন্তী তার কাছে ধরা দেয়নি, ধরা দিয়েছে অন্তরের আকুল আবেদনে। জয়ন্তীর চরিত্রের যা ক্রুটী সেই তার অলঙ্কার।

এই যে মেয়েটি প্রাণ ও মনের মর্মমূলে এভাবে আঘাত করলো টুটুলের মনে হল সে তাকে ভালবেসেছে—কিম্বা এ আর এক ধরণের মন দেয়া নেয়া খেলা হিসাবেই সে গ্রহণ করেছিল যে, এ-কালিনী নারীরা দান ও গ্রহণের কোনও চুক্তিতে পারস্পরিক সখ্যতায় বদ্ধ হয় না, সবই সাময়িক, হৃদয় বৃত্তির কোন মূল্য নেই, সাগরের মত প্রশস্ত-তাদের হৃদয়ে কিম্বা সে হৃদয়ে কোনও দাগ পড়েনা। টুটুলের মনে মনে গর্ব ছিল একালিনী-মেয়েদের সে বিশেষ রকম জানে, মেয়েরাও ছেলেদের চেনে, তাই খেলাকে খেলা হিসাবেই গ্রহণ করে, তার মধ্যে এতটুকু গুরুত্ব থাকে না। পথ চলতে দেখা এই মেয়েটিও যে তাদের সমগোত্রীয়া নয় তা টুটুল বুঝলো, আর যাই-হোক প্রেম তার কাছে খেলা নয়, আর সে খেলায় জয়ন্তী কোনদিনই অংশ গ্রহণ করবে না। ভাল সে বাসবে, ভালবাসার অন্তর্নিহিত গুরুত্বটুকু

উপলব্ধি করেছে বলে, ভালবাসা তার কাছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, তার মধ্যে এতটুকু কৃত্রিমতার ছোঁয়াচ নেই।

—জয়া, জয়া, টুটুল গুঞ্জন করলো।

জয়তী মৃদুস্বরে বল্লে—কি বলছো?

টুটুল বাণীহীন, চিন্তা, সন্দেহ ও অনুশোচনায় টুটল বিধ্বস্ত, সবচেয়ে বেশি দহন করচে এই অনুশোচনা।

জয়তী বিস্মিত হল বটে কিন্তু তবু জীবনের এই আনন্দমুখর মুহূর্তের উজ্জ্বল্য এতটকু ম্লান হয়নি, জয়তী টুটুলের কাছে এগিয়ে এল।

যে-দুঃসাহস ও বাধাহীন শক্তি প্রভাবে টুটুল জয়তীকে প্রথম চুম্বনে অভিষিক্ত করেছিল, সেই শক্তি বশেই পুনরায় জয়তীর শুখ্‌নো চুলগুলির ভিতর আঙ্গুল চালিয়ে দিয়ে টুটুল বল্লে—জয়তী তোমার ব্যবহার আমাকে শুধু মুগ্ধ করেনি, আমাকে গভীর ভাবে আঘাত করেছে—আমরা আমাদের কাছে পরিচিত নই, তুমি আমাকে যা জানিয়েছ আমি তাও জানাইনি তোমাকে, হয়ত এই ঠিক, এই ভাল। আবার যদি আমরা অকস্মাৎ সম্বিৎ লাভ করে যা সামাজিক ও শোভন তাই গ্রহণ করি, তা হলে হয়ত আমরা চূর্ণ হব, আমাদের এই স্বপ্ন-বিলাস একটা নিদারুণ মিথ্যায় পরিণত হবে। তার চেয়ে এই ভালো—এই উন্মত্ততা, এই সমাজ, সংসার ও সংস্কার বর্জিত মুহূর্তগুলিই আমাদের সারাজীবনের সম্পদ হয়ে থাকুক।

কুণ্ঠিত কণ্ঠে জয়তী বল্লে—কিন্তু—

গভীর আবেগভরে টুটুল তৎক্ষণাৎ একটি নিবিড় চুম্বনে জয়তীর সব কথা বন্ধ করে দিল, তারপর বল্লে—না, না, এতটুকু কিন্তু নেই। আমরা আমাদের ভালোবাসি, এই সবচেয়ে বড় কথা, আর কিছুরই প্রয়োজন নেই, এই স্বপ্নটুকুই আমাদের থাকুক, সহসা যদি ঘুম ভেঙে

যায়; যদি দেখি স্বপ্ন স্বপ্ন-ই; তবে আমার জীবনে সেই স্বপ্নেরই জাল রচনা করে যাব।

জয়তীর বিস্ময় ও বিভ্রান্তির আর সীমা নেই, টুটুল কি বলে? কি এর অর্থ! কি প্রয়োজন ঘুম ভাঙার? স্বপ্নের সত্যতা পরীক্ষার জন্যই জেগে ওঠার কোনো কারণ নেই। এই ত' চরম সত্য, এই সান্নিধ্য এই অন্তরঙ্গতা, এর চাইতে রোমাঞ্চকর আর কি আছে! জীবনের এক অনাস্বাদিত মাধুর্যের সন্ধান মিলেছে।

কিন্তু এই যদি স্বপ্ন হয়, এ স্বপ্ন স্বপ্নই থাকুক, এ স্বপ্নের পরিণতি তার কাম্য নয়। এই স্বর্গীয় উন্মত্ততার আবরণ কাটিয়ে পৃথিবীর রূঢ় আলোকে নেমে আসার কামনা তার নেই। দীর্ঘকালস্থায়ী একটি নিরবিচ্ছিন্ন স্বপ্নের আবরণে তার সকল বেদনা ঢাকা থাক।

জয়তী এতক্ষণে বল্লে—এমন মধুর করে তুমি আমাকে ডাকলে, এমনই এক অপূর্ব স্বপ্নে আমাকে আচ্ছন্ন করলে। অথচ কেন তুমি নিজেকে এমন গোপন করে রাখচো, কি তোমার পরিচয় কেন আমাকে জানালে না?

একথায় আবার টুটুলের চোখে সেই বিষাদ ও বেদনার ছায়া নামলো। সে নীরবে জয়তীর শীতল ও কোমল হাত দুখানি নিজের উষ্ণ হাতের কঠিন স্পর্শে নিপীড়িত করলো। জয়তী তাকে ভারী বিপন্ন করে তুললো, জয়তীর সামান্য কথাগুলি টুটুলের অন্তর তীক্ষ্ণ বিবেক দংশনের জ্বালায় পরিপূর্ণ করে দিল। এইবার সে স্বেচ্ছায় জয়তীকে ছেড়ে দিয়ে জানালার কাছে গিয়ে একটি সিগ্রেট ধরালো, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বল্লে—রাত অনেক হয়েচে জয়তী, যাও শুতে যাও।

জয়তী টুটুলের সংশয় ও সংকটাকুল চোখের দিকে তাকালো,

জয়তী বুঝলো এমন একটা অশান্তির বেদনা টুটুলের অন্তরকে দহন করছে যা তার মোটেই বোধগম্য নয়। এই অনধিগম্য মনের গহ্বরে নামা শক্ত, আর বুঝলো এই পরিচয়ের আড়ালটুকু আঁকড়ে থাকার মধ্যে একটা গভীর রহস্য বর্ত্তমান।

জয়তী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বল্লে—তুমিও এবার শুয়ে পড়।

জয়তীর চোখের দিকে না তাকিয়ে টুটুল বল্লে—হ্যাঁ জয়া, কাল সকালে আবার কথা হবে।

জয়তীর অন্তর সহসা তীব্র বেদনায় পূর্ণ হ'ল। যে স্বপন মাধুর্যে জীবন এতক্ষণ পরিপ্লুত ছিল তা যেন সহসা অন্তর্হিত হল। জয়তী টুটুলকে আরো কিছু বলতো, কিন্তু উদগত অশ্রুরাশি তাকে নির্বাক করে রাখলো। জয়তী তাড়াতাড়ি ৭নং ঘরে ঢুকলো, এই ঘরই তার জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছিল।

ঘরের ভিতর এসে জয়তী বিছানায় লুটিয়ে পড়লো, পাশেই তার স্যুটকেশ পড়ে রয়েছে, জয়তী আপন মনে এ দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করতে লাগল। তার দু'চোখ বেয়ে বর্ষা বিস্ফারিত নদীর ধারার মতো আকুল অশ্রুরাশি প্রবাহিত—টুটুলের এই রহস্যময় প্রকৃতির জন্য একটা কৈফিয়ৎ চাওয়া যেতে পারত, কিন্তু জয়ন্তীর কণ্ঠ-রুদ্ধ।

সহসা রাত্রির সেই অনন্ত স্তব্ধতা ভেদ করে একটা মোটরের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠলো। এ শব্দ তার পরিচিত, এই মোটরেই সে আর টুটুল আজ সন্ধ্যায় এখানে এসেছে।

তবে কি টুটুল তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, অসম্ভব।

তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে জানালার শার্শি খুললো জয়তী, নীচের

চেয়ে দেখলো, টুটুলের সেই বিশাল গাড়িখানি নিরুদ্দেশের পথে ছুটে চললো।

জয়ন্তী চীৎকার করে উঠলো—টুটুল—টুটুল।

অন্ধকারের কঠিন গাত্রে আছাড় খেয়ে সে ধ্বনি করুণ আর্তনাদের মত শূন্যে অনুরণিত হ'ল।

টুটুলের সেই বিশাল গাড়িখানি বিকট শব্দ করে অন্ধকারের মধ্যে ছুটে চললো, এবং ক্রমশঃ তা পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল।

জয়ন্তী গভীর হতাশায় জানালার পাশ থেকে সরে এসে আবার বিছানায় লুটিয়ে পড়ল।

অন্ধকারের এই নিদারুণ নৈঃশব্দ ভেদ করে যে অদৃশ্য হয়ে গেল জয়ন্তী জানে সে আর ফিরবে না।

বিছানার প্রান্তে এইভাবে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে প'ড়ে থাকবার পর একটা ঠাণ্ডা হাওয়া জয়ন্তীর সারাদেহ কাঁপিয়ে তুলল, দেহের সমস্ত শিরাগুলি যেন একসঙ্গে অচল হয়ে গেছে, খোলা জানলার ভিতর দিয়ে হু হু ক'রে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঘরের আবহাওয়া ক্রমেই শীতল করে তুলছে। তন্দ্রাচ্ছন্নের মত ধীরে ধীরে উঠে জানলাটা বন্ধ করে জয়ন্তী শাড়ি থেকে ব্রুচ্‌টা খুলতে খুলতে বারবার ভাবতে লাগল, টুটুল কেন এ ভাবে হঠাৎ পলায়ন করলো। হয়ত সে আবার ফিরে আসবে, হয়ত একটু ঘুরে আসবার জন্যই বেরিয়েছে, কিন্তু তা সম্ভব নয়, সারাদিন ধরেই ত' সে ড্রাইভ করছে, সখ করে আবার এই গভীর রাত্রে ভ্রমনে বেরোন অসম্ভব। হয়ত সাময়িক মনোবেদনার ফলেই সে এমনই অকস্মাৎ উধাও হয়েছে, লোকালয় থেকে দূরে, জয়ন্তীর সান্নিধ্য থেকে—এই শেষের চিন্তাটিই জয়ন্তীকে আকুল করে তুলল।

বিছানার ওপরকার সেই সুটকেসটি জয়তী এতক্ষণে বিছানা থেকে নামিয়ে রাখল, তারপর আবার জানলা খুলে রাত্রির সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াল, যদি মোটরের আওয়াজ পাওয়া যায়।

এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা তিন ঘণ্টা কেটে গেল, কিন্তু সেই অখণ্ড স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মাঝে মাঝে পেচকের শোকাতুর কণ্ঠ ছাড়া আর কোনো শব্দই শোনা গেল না।

বর্ষণক্লান্ত আকাশ ক্রমশঃ ধূসর হয়ে এল, পূর্ব দিগন্তের প্রান্তসীমায় আলোর আভাষ পাওয়া গেল, সে আলোকে জয়তীর ঘরখানিও উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। জয়তী তখন তেমনই চুপ করে বসে আছে, চিন্তার আর তার শেষ নেই। এখন সে বুঝেচে টুটুল আর ফিরে আসবেনা, কোনো অজ্ঞাত কারণে টুটুল তার কাছ থেকে সরে গেল।

কয়েকটি মূহূর্ত মাত্র! কি প্রয়োজন ছিল এই ভালবাসার অভিনয়ের? কিন্তু সত্যই একি শুধু অভিনয়? জয়তীকে টুটুল ভালোবেসেছে, জীবনে মাধুর্য এনেছে, দেহ-মনে শিহরণ জাগিয়েছে, জীবনে যেন স্বপ্ন-লোকের রাজপুত্রের আবির্ভাব। তারপর যেমন আকস্মিক তার আবির্ভাব তেমনই বিচিত্র তার তিরোধান।

কি এই রহস্য কে জানে! কেন সে এমন মধুর মিথ্যা কথা তাকে শোনালো, কি উষ্ণ আবেগে জয়তীকে সে বুকে টেনে নিয়েছিল, চুম্বনে সে কি উন্মাদনা! তারপর নিতান্ত কাপুরুষের মত রাত্রির অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া, কি প্রয়োজন ছিল এই ছলনার?

জয়তী কি করেছে? নিজেকে কি সে এতই লঘু করে ফেলছে? এতই সে তুচ্ছ? হয়ত জয়তীর সারল্যের সুযোগ নিয়ে টুটুল এতদূর

অগ্রসর হয়েছিল, তারপর তার আন্তরিকতা লক্ষ্য করে তৎক্ষণাৎ সভয়ে পালালো।

এই কথা মনে হওয়ায় লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে জয়তী সারাদেহে যেন বৃশ্চিক দংশন অনুভব করলো। অদৃষ্টের কি বিচিত্র পরিহাস! তবু—এই চিন্তার বিরুদ্ধে কি যেন বিদ্রোহ করতে চায়, জয়তীর মন যেন বলতে চায়, না—না, এ সত্য নয়। টুটুলের প্রেম নিবেদন ও আকস্মিক অন্তর্ধানের মধ্যে একটা গভীর রহস্য বর্তমান।

অনিদ্রা ও শ্রান্তিতে জয়তীর চোখদুটি রাঙা হয়ে উঠেছে, অন্তর বেদনায় ভেঙে পড়েছে—অবশেষে জয়তী উঠে সেই প্রত্যুষে বাথরুমে ঢুকে স্নান সেরে নিলে। দেহ যেন এতক্ষণ এইটুকুই প্রার্থনা করছিল। এই স্নানের ফলে সারাদেহে নবজীবনের সূচনা অনুভূত হ'ল।

প্রভাতের আলোয় এই ছোট্ট অপরিচিত বাড়িটি বড়ই বিচিত্র লাগল। রাতের অন্ধকারে অপরিচিত স্থানে যদি যাওয়া যায়, দিনের আলোয় তা কেমন অদ্ভুত বোধ হয়। আর নিজের শ্রান্ত বিশীর্ণ দেহখানির দিকে তাকিয়ে জয়তী ভাবল—গত রজনীতে টুটুলের সঙ্গে এই হোটেলে যখন সে এসেছিল তখনকার সেই জয়তীর সঙ্গে এখনতার কত প্রভেদ। কেন সে নিজেকে এই অকারণ বিলাসে হারিয়ে ফেলেছিল, সেই মুহূর্তগুলি কিসের ইন্দ্রজালে পরিপূর্ণ ছিল কে জানে? জয়তীর হয়ত জানা উচিত ছিল এ দিনের এই উন্মত্ততার, পরিণাম, পরিতাপ। অনুশোচনায় ও আত্মগ্লানিতে জয়তীর সারা দেহ মন বিষিয়ে উঠল।

নীচের তলায় নেমে জয়তী দেখল সেই প্রত্যুষে পাহাড়ি চাকর পরমোৎসাহে জল ঢেলে সিঁড়ি ধুতে আরম্ভ করেছে, জয়তী তাকে প্রশ্ন করল—চায়ের ব্যবস্থা হ'তে কত দেরি?

পাহাড়ি সবিনয়ে জানালো,—দেরি সামান্যই, চুল্লীটা ধরে গেলেই আর দুধ এলেই চা তৈয়ারী হয়ে যাবে।

জয়তী বুঝলো তার মানে সাড়ে সাতটা, এতক্ষণে পথপ্রান্তে পতিত সেই ক্ষুদে গাড়িখানির কথা জয়তীর মনে হ'ল। এই চিন্তাই যেন তাকে কঠিন আঘাত করে মাটির পৃথিবীতে টেনে আনলো। মেঘের আড়ালে বসে গত রজনীর দুঃস্বপ্নের কথা চিন্তা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাভ কি? স্বপ্নকে স্বপ্ন হিসাবে গ্রহণ করেই রূঢ় রুক্ষ পৃথিবীর বাস্তব আবহাওয়ায় ফিরে আসা যাক, স্বপ্ন—স্বপ্নই। টুটুল ত' বলেছিল—

"এই স্বপ্নটুকুই আমাদের থাকুক, সহসা ঘুম ভেঙে যদি দেখি স্বপ্ন স্বপ্ন-ই, তবে সারা জীবনে সেই স্বপ্নেরই জাল রচনা করে যাব।"

তাহলে টুটুল তখনই সব জানত, এ যে স্বপ্ন, সত্য নয় তা সে জান্‌ত, কিন্তু জয়তী কি নির্বোধ, উন্মত্তের মত সে একি করে বসেছে, এতক্ষণ সে নির্বোধের স্বর্গে বাস করছিল।

পাহাড়িটিকে পুনরায় প্রশ্ন করে জয়তী জান্‌লো একটি মোটরের কারখানা বাজারের ওপরই আছে, হোটেল থেকেও বেশি দূর নয়—। জয়তী মনে মনে ভাবলো এটুকু পথ হেঁটে যেতে যেতেই বেশ বেলা হয়ে যাবে। তারপর গাড়ির একটা বন্দোবস্ত করা যাবে। গাড়ি যদি একান্তই সহজে সারানো না যায়, তা'লে দিল্লীর গাড়ি কখন সুবিধামত পাওয়া যাবে জেনে নিয়ে রেলপথেই দিল্লী পাড়ি দিতে হবে। সানন্দা তার আসার আশায় পথ চেয়ে আছে। যেহেতু গত রাত্রে একটা চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে সেইহেতু অকারণে দীর্ঘ সময় নষ্ট করা নিরর্থক।

হোটেলের দরজা পার হতেই পাহাড়ি পিছন থেকে ডাক্‌লো—মেম সা'ব!

বিস্মিত জয়ন্তী পিছনে তাকালো, পাহাড়ি দৌড়ে কাছে এসে ময়লা সার্টের প্রান্তে নিজের হাতখানি মুছে নিয়ে পকেট থেকে একখানি চিঠি বার করে জয়ন্তীর হাতে দিয়ে বল্লে—

—কসুর মাপ কিজিয়ে। ইয়ে লেফাফা আপ্‌কা হ্যায়? জয়ন্তী সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে চিঠিখানি নিয়ে দেখলে সেটি তারই বটে। অপরিচিত হস্তাক্ষরে বাংলায় লেখা আছে 'জয়ন্তী দেবী'।

অতিকষ্টে রুদ্ধকণ্ঠে জয়ন্তী বল্লে—মেরা হ্যায়। 'হুজুর'—! বলে পাহাড়ি আবার কাজ করতে গেল। জয়ন্তী ধীরে ধীরে আবার হোটেলে ফিরে এসে সাম্‌নের একটি চেয়ারে বসে পড়ল। টুটুলের গাড়ি চলে যাবার পর যে জড়তা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—আবার সেই জড়তা তাকে গ্রাস করলো।

লেফাফার মোড়ক খুল্‌তে গিয়ে জয়ন্তীর চোখ বেয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। জয়ন্তী জানে এ চিঠি টুটুল যাবার সময় রেখে গেছে। জয়ন্তীর সারা শরীর শিহরিত হ'ল। হয়ত এতক্ষণে গত রজনীর ক্ষণস্থায়ী অথচ রমণীয়, গভীর এবং বেদনাদায়ক রহস্যের সমাধান ঘট্‌বে, পুলক ও বেদনায় জয়ন্তীর তণুদেহ রোমাঞ্চিত হ'ল, টুটুলকে সে ভালোবাসে। যদি জীবনে আর কখনও তার সঙ্গে দেখা না হয় তবু—তবু তাকে জয়ন্তী ভালোবাস্‌বে, সারা জীবন তাকেই স্মরণ করবে। যে-মুহূর্তে তাকে আবেগভরে সর্বপ্রথম আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছিল সেই মুহূর্তেই জয়ন্তী মনে মনে এই সঙ্কল্প করেছিল। চিঠিখানি পড়তে গিয়ে—জয়ন্তীর হাত কেঁপে গেল।

জয়ন্তী যদি দীর্ঘ কৈফিয়ৎ আশা করে থাকে তাহ'লে তাকে হতাশ হ'তে হবে। টুটুল সামান্য কটি লাইনে

লিখেছে—

'জয়তী! যদিও স্বার্থপরের মত তোমাকে আমি ভুলতে চাই, তবু তোমার কাছে বোধকরি ক্ষমা ছাড়া আর কিছুই আমার চাইবার নেই। আমি বিবাহিত, আর সেই সমাজগত বন্ধনটুকুই আমার এই অপ্রত্যাশিত পলায়নের একমাত্র কৈফিয়ৎ, এই কারণেই আমাদের হয়ত আর দেখা হবে না, কিন্তু আমি যে তোমাকে সত্যি ভালোবাসি এই কথাটাই বিশেষ করে জানাতে চাই। তুমি আর এই বিচিত্র রাতটি আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল। বিদায়—টুটুল—'

জয়তী চিঠিখানি মুড়ে নিয়ে ব্লাউজের ভিতর সযত্নে রেখে দিল, তারপর পাহাড়ির কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে আবার পথে নেমে পড়ল।

জয়তী আপন মনেই অস্ফুটকণ্ঠে বল্লে—বিবাহিত—তাই!

তাই সে চলে গেছে। টুটুল কাপুরুষ নয়, জয়তীর জন্যই তার এই আকস্মিক পলায়ন। এ সংসারে অজস্র লোক আছে যারা অনুরূপ ক্ষেত্রে হয়ত টুটুলের মত' এমন ব্যবহার করতে পারতো না। কিছুক্ষণের জন্য সে সব ভুলে গিয়েছিল, সব কিছু ভুলে' উভয়ে উভয়কে বাহুর বাঁধনে বেঁধেছিল—তারপর যা সত্য, যা বাস্তব, তারই আঘাতে সচেতন হয়ে বেত্রাহতের মত পালিয়েছে। আর কী সে করতে পারে—আর কিইবা উপায় ছিল!

জয়তীর সঙ্গে দেখা করে সব কথা বুঝিয়ে একটা নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে হয়ত বিদায় নেওয়া যেত, কিন্তু টুটুল তাকে বাঁচিয়েছে।

জয়তী অন্ধের মত পথ চলতে লাগল। পথের দুপাশের কোন জিনিষই সে দেখতে পেলনা, কারণ দুটি চোখ তার অশ্রু বাষ্পে ঢাকা। পথ চলতে চলতে সেই অশ্রুধারা দুচোখ বেয়ে প্রবাহিত হতে লাগল, গভীর নৈরাশ্যে তার বুক ভেঙ্গে গেছে। শরত কালের শিউলি ফুলের

মত, রাতের ফুল যেমন প্রাতে ঝরে যায়, তেমনই এক রাতের মধ্যে প্রেমিকের আবির্ভাব ও তিরোধানের মত করুণ আর কি আছে। এক মুহূর্তেই সব কিছুর অবসান। কখনও কোনদিন আর এই হঠাৎ পাওয়া ও হঠাৎ হারাণো মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া যাবেনা। টুটুল সম্বন্ধে যা জানা গিয়েছিল তার বেশি আর কি-ই বা জয়তী জানে! সম্পূর্ণ নামটি পর্যন্ত জয়তীর জানা নেই, কে তাঁর স্ত্রী, কি বা তাঁর মূর্তি, উভয়ে উভয়কে নিয়ে সুখী কি অসুখী কে জানে? সুখী যে নয়, সে বিষয়ে জয়তী নিঃসন্দেহ, নইলে কখনই এভাবে তার সঙ্গে টুটুল প্রেমালাপ করতে পারতনা—জয়তী মনে মনে এই সব কথা নিয়ে তর্ক করতে লাগল। জয়তী নিঃসন্দেহে জানে টুটুল সুখী নয়, জীবনে শান্তি নেই মনে এতটুকু শান্তি নেই।

যা কিছু টুটুল বলেছিল জয়তী তা মনে করতে লাগল। যদিও টুটুল এতদূর চলে গেছে তবু জয়তী তার কথা মনে আলোচনা করে তাকে অন্তরে অনুভব করলো। কত কি খুঁটিনাটি কথা মনে রয়েছে। যাইহোক জয়তীকে টুটুল ভুলবে না, ভুলতে পারেনা, সে কথা সে স্বীকার করেছে। এই কথা ভেবে তবু জয়তী কিছু সান্ত্বনা অনুভব করলো। টুটুলের চিঠিখানা জয়তীর জীবন পথের অতুল-সম্পদ। এই চিঠিতে গত রজনীতে যে কথা টুটুল বার বার বলেছে সেই কথারই পুনরুক্তি রয়েছে: তোমাকে ভালবাসি। ইচ্ছে হলে জয়তী আমরণ—প্রতিদিনই, এই কথাটি বারবার পড়তে পারবে, এর মধ্যেই রয়েছে তার অখণ্ড সান্ত্বনা।

এখন জয়তী বুঝলো টুটুলের কাছে এ শুধু সাময়িক ভাববিলাস নয়, কৃত্রিম নর্মাচার নয়, জয়তীর মতে এই মন দেয়া নেয়ার মধ্যে প্রাণের পরিচয় বর্তমান। অনাগত কালের প্রেমহীন, শ্রীহীন রুক্ষ

দিনগুলিতে এই বিগত দিনের পুলক-স্পর্শের কথা স্মরণ করার মধ্যেই ত' সার্থকতার আনন্দ পাওয়া যাবে, এই এতটুকু ছোঁয়া, এতটুকু কথা নিয়েই রঙে রসে স্বপনের জাল রচনা করে জয়তী সারাজীবন কাটিয়ে দেবে।

গ্যারাজের কাছাকাছি পৌঁছে জয়তী শাড়ীর প্রান্তে চোখ মুছলো, অশ্রুসিক্ত সেই বিষণ্ণ মুখখানিতে আবার তারুণ্যের মধুরিমা ফুটে উঠলো। জয়তী মনকে বোঝালো—আর নয়, আত্মস্থ হবার সময় হয়েছে, আবার সাময়িক বিকারের ঘোর কাটিয়ে এবার সচেতন হতে হবে। টুটুলের আবির্ভাবকে মিথ্যার মধুর ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছু ভাবা উচিত নয়,—এই ইন্দ্রজালপর্ব সারাজীবনে একবারই আসে, তাই নিয়ে তা বলে সারাজীবন ধরে কাঁদার কোনও অর্থ নেই, মানুষ শুধু স্মৃতিটুকু সম্বল করে বেঁচে থাকে না, জীবন অনেকবড়, অনেক কাজ আছে, এতকাল কাজের মধ্যেই ত' সে আপনাকে ভুলিয়ে রেখেছে, সেই কজের মধ্যেই আবার সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মনে পড়ল—

"– মোর লাগি করিয়ো না শোক
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি' কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে—"

টুটুলের কথা রইলো মনের গহনে, সেখানে সেই একান্ত নিভৃত কোণে জয়তী ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার নেই, পৃথিবীর আর কেউ জানবে না। সেই নিভৃতলোকে থাকবে টুটুল আর জয়তী।

কিছুক্ষণ পরে জয়তী আবার শান্ত হয়েছে, মনোবিকার কেটে

গেছে, অন্তরে আর এতটুকু গ্লানি নেই। জয়তী তার ছোট্ট গাড়ির 'স্টিয়ারিং' ধরে বসেছে, গাড়ি ছুটেছে দিল্লীর পথে।

গাড়ির ব্যাধি ছিল সামান্যই, কারখানার কারুকার্যে তা সহজেই সংস্কৃত হ'ল—মাইলের পর মাইল ছুটতে ছুটতে ছিন্ন 'সাইড স্ক্রীনে'র দিকে চোখ পড়তে জয়তীর ম্লান মুখে হাসি এল—তার ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখে আবার রঙের আভাষ ফিরে এল।

জীবনটা অপূর্ব নাটকীয় ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ, কিছু প্রহসন—কিছু ট্রাজেডির পরিবেশ। গত রজনীতে বহুমূল্য বিরাট গাড়িতে সৌখীন সুবেশ টুটুলের সঙ্গে এই হোটেলে সে এসেছিল—স্বপন বিলাসে কয়েকটি উজ্জ্বল মুহূর্ত কোথায় মিলিয়ে গেল। আর আজ, জয়তী একা তার পুরাণো ঝরঝরে গাড়িখানি নিয়ে অজানার পথে চলেছে, গত রজনীর কথা উদ্দাম কল্পনা মাত্র নয়, তার একমাত্র প্রমাণ টুটুলের ছোট্ট চিঠিখানি।

আত্মীয়রা একথা জানলে কি ভাববেন? যার নাম পর্যন্ত জানা নেই, তার সঙ্গে শুধু পরিচয় নয়—হৃদয় বিনিময় ও গভীর ভালবাসা একি সম্ভব। সানন্দা হয়ত এতখানি আশ্চর্য হবে না, কারণ তার জীবনের ধারা সাধারণের চাইতে বিচিত্র, তারা মুক্ত পক্ষ পাখির মতই স্বাধীন, আকাশের মত প্রশস্ত তাদের বিচরণ ক্ষেত্র, বহু ধনীজনের ভিড়ে মন তাদের চাপা পড়ে গেছে, আর তা ছাড়া জয়তী এসব কথা তাদেরই বা জানাবে কেন।

দুপুর কাটিয়ে নূতন দিল্লীর সফদরজঙ্গ অঞ্চলে ক্লান্ত জয়তীর রথ পৌঁছলো—এইখানেই সানন্দারা থাকে, বাড়ির নাম 'মন্‌জিল'।

যদিচ মানসিক ও দৈহিক অবসাদে জয়তী অত্যন্ত বিব্রত, তবু

গেটের ভিতরে যেতেই তার চিত্ত আকুল হয়ে উঠলো, কি সুন্দর বাগান! মোগল বাদশাহের স্মৃতি বিজড়িত এই বিদেশে সানন্দা কি সুন্দর করেই না বাড়ি সাজিয়েছে, বাড়ি ত' নয় রাজপ্রাসাদ!

মধ্যাহ্ন সূর্য মেঘাচ্ছন্ন, বাগানের চারিদিকে অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে, কোথাও শুধু লাল গোলাপ, কোথাও নানা রঙের ক্যাণাফুল, তা ছাড়া হরেক রকম মরশুমিফুল ত আছেই, সানন্দার সৌন্দর্যবোধের প্রশংসা করতে হয়। এত ফুল, এত রঙ, এই বৈচিত্র্য জয়তীর সারা মনকে আচ্ছন্ন করলো।

এর মাঝে আবার লন আছে, টেনিস কোর্ট, পথের দুপাশে চন্দ্রমল্লিকার টব সার বেঁধে সাজানো—এই সানন্দার বাড়ি।

সানন্দা ধন্য! অথচ এই সানন্দাই দুঃখ করে বলেছে, 'কি বিশ্রী যে লাগে, কি আর বলব জয়া, এমন দেশে মানুষ থাকে।' এর চাইতে নাকি কলকাতা তার কাছে স্বর্গ। এখন স্বচক্ষে 'মন্‌জিলের' সৌন্দর্য দেখে জয়তী তাই সানন্দার খেদোক্তির অর্থ বুঝলো না।

সানন্দার সম্পর্কে আরো অনেক কিছুই যে দুর্বোধ্য তা লাঞ্চ খাবার সময় জয়তী বুঝলো, এখানে সবই সাহেবী কেতা, লনের এক পাশেই টেবিলে খানা সাজানো হয়েছে, উর্দি পরা খানসমাবৃন্দ ইতস্ততঃ ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। এত আড়ম্বরে ও আতিশয্যে জয়তী একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো, এতখানি উদ্‌ভ্রান্তকর ব্যবস্থায় সে অভ্যস্ত নয়, চিরদিন সহজে ও সাধারণভাবেই সে জীবন কাটিয়েছে, কিন্তু সানন্দা এই সবই জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। অথচ সে সব কিছুতেই অস্বস্তি বোধ করে—সব তাতেই অসন্তুষ্ট।

লেমন স্কোয়াস্ খেতে খেতে সানন্দা গলার স্বর অত্যন্ত করুণ

করে বল্লে—বাঁচালি জয়া, তুই এসেছিস খুব ভালো হয়েছে, আমি একা একা আর পারিনা, বিশ্রী লাগে আমার, তুই এখন কিছুদিন আমার কাছেই থাক। একটা কেউ নেই যে দুটো মনের কথা বলি, কেবল সংসার আর সংসার। তুই-ই দেখ এসব।

সানন্দার কথায় জয়তী চমৎকৃত হয়ে হাসল—এখন তাহলে সানন্দার সংসার তাকে দেখতে হবে। অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি।

—উনি এলে কোন কথাই উঠবে না, এ ত' তোর নিজেরই বাড়ি। এমন পাগল মানুষ যদি দুটি থাকে, 'মন্‌জিল', 'মন্‌জিল' করে পাগল, বাড়ি যেন আর কারো নেই। আমার ত' ভাই কান্না পায়—তুই সব বুঝে নিলে আমি দিনকতক একটু বিশ্রাম করি, শরীরটা কি হয়েছে দেখছিস ত'? এত খিটখিট ভালো লাগে?

—জামাইবাবু কি খুব খিটখিট করেন নাকি?

—দিনরাত, আমি ওসব কথায় কান দিই না, অত সব শুনতে গেলে কদিন বাঁচবো। আমিও তেমনি ওঁর কোন কথায় থাকি না—মানে কেউ কারুর—'

—তা তো জানতুম না দিদি, আহা—

—আহা টাহা নেই ওর ভেতর, এ আমাদের সয়ে গেছে ভাই, আমিও তেমনি আমার মতে চলি এতটুকু মনের মিল নেই জয়া—এ কথায় জয়তী ব্যথিত ও বিস্মিত হল, কিন্তু সানন্দা তেমনই লঘুভাবে হাসতে লাগল।

জয়তীর মুখে বেদনার আভাষ লক্ষ্য করে সানন্দা বল্লে—আমি দেখছি তুই আজো সেই রকমই আছিস জয়া, কেবল তোদের কবিত্ব আর বড় বড় কথা, এতদিন ত স্বদেশী টদেশী করলি কিন্তু বুদ্ধি এখনও

তোর পাকেনি, যতদিন এভাবে থাকা যায় ততদিনই ভালো, দু'চারটে প্রেম ট্রেম করলি, না এমনিই—?

জয়তীর মুখখানি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো, চোখ নামিয়ে নিয়ে অতিকষ্টে সে বল্‌ল—না!

সানন্দা তার এই ব্রীড়াকুণ্ঠভঙ্গি লক্ষ্য করে মনে মনে ভাবল—কি আশ্চর্য! জয়া এখনও সত্যি সত্যি "ব্লাস" করে, এখনও এত লজ্জা! যাই হোক, মেয়েটা ভালো, বেশ ঠাণ্ডা মেয়ে, আমার ভারী ভাল লাগে।

জয়তী ভাবতে লাগল—সানন্দাকে টুটুলের কথা বলা চলে না, ও কি ভাববে।

সানন্দাকে কোনও গোপন কথা বলা চলে না, বরাবরই ও যেন কেমন এক ধারা। এখন ত' আবার ঐশ্বর্য ও বিলাসের বিচিত্র আব-হাওয়ায় চব্বিশ বছরেই—চল্লিশের মত তার ভঙ্গী করছে। সুন্দরী বটে সানন্দা, যতই সে নিজেকে অসুস্থ বিবেচনা করুক, এই কৃশ শরীরই তাকে অসামান্য রূপসী করে তুলেছে, এত সুন্দর জয়তী আর কাউকে দেখেনি, শাদা ঘাড়ের কাছে অজস্র চুলের এলো খোঁপা এসে পড়েছে, নীলাভ চোখের ওপর—ঘন কৃষ্ণ ভ্রূধনু—(পেনসিলে আঁকা নয়), যদিচ সানন্দা যথেষ্ট মেক্‌আপের সাহায্য নিয়েছে তবু তার মুখখানি সুনিপুণ শিল্পীর নিখুঁৎ ছবির মতই অপূর্ব। তবে সরু পাতলা ঠোঁটদুটির মধ্যে দৃঢ়তা ও স্বার্থপরতার একটা সুস্পষ্ট ছাপ আছে। হাঁসলে সানন্দাকে আরো চমৎকার দেখায়, কিন্তু গম্ভীর হলে তাকে সাপের চেয়েও ক্রুর বলে মনে হয়।

সানন্দার স্বামীর ওপর জয়তীর করুণা হ'ল,—কিংবা সত্যিই হয়ত বেয়াড়া স্বামী, হয়ত দুজনেই স্বার্থপর, প্রাচুর্যের মধ্যে দুজনেই আত্মহারা হয়ে আছে।

আরো কত কথা—সনন্দার কত বন্ধু বান্ধব আছেন, তাঁরা তাকে ভারী প্রশংসা করেন, শীগ্‌গীরই একটা রেসিং কার কেনা হবে, সানন্দার নিজের ব্যবহারের জন্য (ইতিমধ্যেই জয়তীর ছোট্ট গাড়ির সম্পর্কে যথেষ্ট হেসেছে, বলেছে 'মজার গাড়ি'), সামনের মাসে বাড়িতে একটা পার্টি দেওয়া হবে, পোড়া দেশে দাসী চাকর পাওয়া যায় না ইত্যাদি—এবং জয়তীকে কি কি দেখা শোনা করতে হবে, এমনই কতো অজস্র কথা হ'ল। যতকিছু চিঠিপত্র আসবে সবই জয়তীর দেখার ভার পড়ল, চাঁদার তাগাদা কোথায় কোন সভা সমিতিতে নিমন্ত্রণ সব জয়তী দেখবে। সানন্দার এত সব খুটিনাটি দেখার সময় নেই। জয়তীর হাতে সমস্ত ভার দিয়ে সানন্দা এবার মুক্তির নিশ্বাস ফেলবে।

আহারাদির পর জয়তীকে সারা বাড়িখানি ঘুরে ঘুরে দেখান হল, এত ঐশ্বর্যে চোখ যেন ঝলসে যায়, প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। অজস্র ঘর, বহুমূল্য আসবাব, কাশ্মিরী কার্পেট থেকে চীনা ছবি পর্যন্ত কত কি, একখানি ঘর আধুনিক সাজে সজ্জিত, সানন্দা এর নাম দিয়েছে 'খেলাঘর', এখানে পিয়ানো, একপাশে বিলিয়ার্ড টেবল, আর আছে এদিক ওদিকে বসবার বহুমূল্য আসন।

—জয়তী যতদূর বুঝল, স্বামী-স্ত্রীর বিলাতী কায়দায় বিভিন্ন ব্যবস্থা, সানন্দার ঘরগুলির আড়ম্বর পারিপাট্য খুব বেশি, বহুমূল্য আসবাবে সজ্জিত, ঘরের পাশেই চমৎকার বাথরুম।

জয়তীর জন্য যে ঘর নির্দিষ্ট হয়েছে তাও নেহাৎ সামান্য নয়, একখানি শোবার ঘর, একটি বসবার, সে ঘরের বারান্দার সামনেই বাগান ও লন দেখা যায়। জয়তীর ঘরের সঙ্গেও একটি বাথরুম আছে। সানন্দার বিবেচনার প্রশংসা করতে হয়, জয়তীর বসবার ঘরে অজস্র বইও সাজানো আছে।

জয়তী উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্‌লে—কি ব্যবস্থা তোমার দিদি, যেন গ্র্যাণ্ড হোটেলে এসেছি, কি কাণ্ড! আমি আবার তোমার সংসার দেখব, নিজেই কখন হারিয়ে যাব।

সানন্দা খুসী হয়ে বল্লে—তোর খালি পাগলামি, খুব পারবি, এখন একটু বিশ্রাম কর বিকালে সব চাকর দাসীর কাছে তোর পরিচয় করিয়ে দেব।

—তারা কি আমায় সুনজরে দেখবে?

সানন্দা চায় জয়তী এখানে থেকে ছোট খাট সাংসারিক কর্তব্য থেকে তাকে মুক্তি দেয়, তাই দৃঢ়কণ্ঠে বল্লে—তোকে সবাই পছন্দ করবে, অপছন্দের কি আছে শুনি?—জামাইবাবু কোথায় দিদি?

—উপস্থিত ত' নেই দেখছি, আজ রাতেই ফিরবেন নিশ্চয়ই। তোকেই সব দেখা শোনা করতে হবে, সামলাতে হবে। আজ আবার হীরু সেনের সঙ্গে আমার ডিনার আছে, হীরু সেনকে জানিস ত? মানে, নিশ্চয়ই নাম শুনেছিস, এখনকার সবচেয়ে বড় ক্রিকেট খেলোয়াড়, ইণ্ডিয়ার হয়ে সেবার অস্ট্রেলিয়ায় গিছলেন, আমাদের ভারী বন্ধু, সহরে থাকেন, প্রায়ই এখানে আসেন। এর মধ্যে উনি এসে পড়লে তাকে বলিস আমি বাইরে ডিনারে গেছি, উনি আর কিছু প্রশ্ন করবেন না!

জয়তী গম্ভীর ভাবে সানন্দার মুখের দিকে তাকালো। আসল ব্যাপার তা'হলে এই। যা খুসী তাই করে, আর স্বামী যখন বাড়ি ফিরে আসেন তখন সানন্দা নিশ্চিন্ত চিত্তে অন্যত্র আনন্দে কাটায়। এ যেন কেমন কেমন! কেমন এক ধারা! এ ধরণের বিবাহ অন্ততঃ জয়তী নিজে পছন্দ করে না। কি প্রয়োজন এত ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের, কি প্রয়োজন এত আড়ম্বরের, অন্তরে যদি প্রেম না থাকে কি নিয়ে

মানুষ মেতে থাকে? হয়ত জয়তী কল্পনা বিলাসী নির্বোধ, মনের রোমান্টিক ঘোর কাটেনি, এর চাইতে বরং কুঁড়ে ঘরে মনের মানুষটিকে নিয়ে থাকলে হয়ত অনেক শান্তি পাওয়া যায়।

এইবার টুটুলের কথা একটা পুরাতন ক্ষতের মত আবার জয়তীর মনকে নাড়া দিল। টুটুল কোথায় কে জানে? তারও কি এমনই জয়তীর কথা মনে পড়ছে? বিবাহিত টুটুলের জীবন কি এমনই কণ্টকাকীর্ণ! বাড়ি ফিরে কি প্রতীক্ষমানা স্ত্রীর মুখ সেও দেখতে পায় না? কে জানে? সানন্দা অত্যন্ত অলস এবং স্বার্থপর হলেও তারও অন্তরে দরদ আছে, জয়তীর মুখখানা সহসা সাদা হয়ে গেল দেখে সানন্দা বুঝলো জয়তী অত্যন্ত ক্লান্ত। জয়তীকে সে বিশ্রাম করবার জন্য আবার অনুরোধ জানালো।

সানন্দা চলে যাবার পর জয়তী বারন্দায় এসে দাঁড়ালো। সানন্দার দীর্ঘছন্দ দেহ ধীরে মিলিয়ে গেল। শাড়িখানি চমৎকার মানিয়েছে, চলার ভঙ্গীতেও একটা মাধুর্য বর্তমান। পায়ের সাণ্ডালের ভিতর থেকে পায়ের রঙকরা নখ ঝক ঝক করছে।

জয়তী বুঝলো সানন্দার রূপে পুরুষ আত্মহারা হয়ে ওঠে, কারণ তার দেহে মাদকতা আছে, সেই ভালবাসার বিলাসে দাহ আছে কিন্তু গভীরতা নেই, মোহ আছে কিন্তু শান্তি নেই। তাদের জীবন নিয়ে সানন্দা খেলা করতে পারে। স্বচ্ছন্দ মনে সে বিচরণ করিতে পারে, অসতর্ক-গতিছন্দের মধ্যে প্রাণের স্পর্শ নেই—সানন্দা মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে—দেয় না কিছুই. আর হয়ত কিছুই পায় না। নিজের জীবনে যে অসতর্ক, অপরের জীবনের কি দাম তার কাছে।

জয়তী ভাবলে—সানন্দার জীবনে যদি গত রজনীর ঘটনা ঘটত তাহলে কখনই জয়তীর মত নিবিড় ভাবে সেই মুহূর্ত সানন্দাকে স্পর্শ

করত না। একটা মধুর সন্ধ্যা হিসাবেই লঘুভাবে তা সানন্দা গ্রহণ করত।

সহসা জয়তীর কাছে এই বর্ণবিলাস, এই ঐশ্বর্যের আড়ম্বর সব কিছুই বর্ণহীন অকিঞ্চিৎকর মনে হল। এখানে সে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে পারবে না। সে যেন সহসা এক অসীম অন্ধকারে পথ হারিয়েছে, সেখানে সে একান্ত একাকী।

এই সময়েই টুটুলকে যদি কাছে পাওয়া যেত—সেই নিভৃত হোটেলের কক্ষ ছেড়ে এ কোন অরণ্যে সে এসে পড়েছে। টুটুলের সেই বলিষ্ঠ বাহুর স্পর্শ এখনও জয়তীর দেহে শিহরণ আনে.—টুটুলের কণ্ঠস্বর এখনও যেন ছন্দিত হচ্ছে। কি অপূর্ব ইন্দ্রজালেই না সে জড়িয়ে পড়েছে, মুক্তি নেই, মুক্তি নেই।

ক্লান্ত জয়তী বিশ্রান্ত ভঙ্গীতে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল।

মধ্যাহ্নের অলস আবহাওয়ায় শ্রান্ত জয়তী ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙতে দেখা গেল, বেলা আর বেশি বাকী নেই, দিনের সূর্য পশ্চিমে নেমে এসেছেন। এই বিশ্রামটুকুর প্রয়োজন ছিল, জয়তী এখন অনেকটা আত্মস্থ হয়েছে। শাড়িটা বদলিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ পরে জয়তী সানন্দার মহলে নেমে এল! এখানে অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মি এখনও ম্লান হয়নি—চারিদিক ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে। অসংখ্য পাখীর বিচিত্র ঐক্যতান আর ফুলের সুগন্ধে বাতাস আকুল হয়ে উঠেছে। এত মধুর্য, প্রকৃতির এই অপূর্ব বৈচিত্র জয়তীর অন্তরে গভীর ভাবে আঘাত করলো, সমস্ত মন বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। জয়ত মনে মনে সঙ্কল্প করল আর সে টুটুলের কথা চিন্তা করবে না, এখনই সানন্দার স্বামী এসে পড়বেন, এই রাত্রেই আবার সানন্দা থাকবে না,

নিজের আত্ম-পরিচয়. জানিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে জয়তী যে বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়বে সে কথা স্মরণ করে সে এখনই অত্যন্ত কুণ্ঠা অনুভব করল।

হয়ত তিনি একা আসবেন না, বন্ধুরা সঙ্গে আসতে পারেন, এমন কি কোনোও "মহিলা বান্ধবী"—তাও নাকি আসা সম্ভব, অন্ততঃ সানন্দা মৃদু হেসে এই কথা জানিয়েছে।

জয়তী মনে মনে প্রার্থনা জানালো—আজ যেন সেই "মহিলা-বান্ধবী" না এসে পড়েন। তা হ'লে সে সত্যই বড় বিব্রত হয়ে পড়বে।

সহসা পিছন থেকে সানন্দার কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল—ও মা, জয়া এখানে, আমি তোর কাছে লোক পাঠালুম, বস এখানেই চা পর্ব শেষ করা যাক, হাতে এখনও কিছু সময় আছে।

সানন্দার সঙ্গে জয়তীর ড্রইং রুমে এসে দাঁড়াল, বেয়ারাবৃন্দ ইতিমধ্যে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে হাজির, ঘরের সাজ সজ্জা, চায়ের পেয়ালা পিরিচ, সানন্দার প্রসাধন পরিপাট্য সব কিছু জড়িয়ে জয়তীর বার বার কেবল এইচ. জি. ওয়েলস্ বর্ণিত "আগামী কালে"র কথা মনে পড়তে লাগল।

সানন্দা তার তনুদেহে একখানি ক্রীম রঙের পাতলা শাড়ি জড়িয়েছে. (অর্থাৎ এমন ভাবে পরিহিতা যে দর্শকের চোখে তা জড়ানোর মত দেখায়) গায়ে সাটিনের ব্লাউজ, স্টিফ কলার, আর হাত ছুটি সেলোফেনের মত পাতলা টিউনিকে আবৃত, (বাহুলতার স্বাভাবিক সৌন্দর্যের ওপর একটা আবরণ দেওয়া হয়েচে), প্রাচীন গ্রীক পদ্ধতিতে রচিত পায়ের লাল স্যাণ্ডাল—ফরসা পায়ে চমৎকার মানিয়েছে,—

মাথার চুলেও বৈচিত্র্য আছে, কপালের ওপর কিছু চুল অকস্‌ফোর্ড টেরির ঢঙে ওপরে ফাঁপিয়ে রাখা হয়েছে; পিছনে এলো খোপা ঘাড়ে নেমে এসেছে। জয়ন্তী ভাবলে—এর নাম আধুনিকতা নয় উচ্ছৃঙ্খলতা।

চেয়ারে বসতে বসতে জয়ন্তী বললে—এমন সুন্দর করে রেখেছ চারিদিক, মনে হচ্ছে যেন স্বর্গরাজ্যে চলে এসেছি।

সানন্দা পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে বললে—দু'চারদিন এমনই মনে হয় বটে, কিন্তু চিরদিন তা মনে হবে না। তারপর জয়ন্তীর সামনে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে বললে—আমার তৈরি চায়ের খ্যাতি আছে।

জয়ন্তী ম্লান হেসে পেয়ালাটি ঠোঁটে তুলে ধরল।

সানন্দা প্রশ্ন করল—কেমন ভালো লাগছে? জয়ন্তী হেসে বল্লে—ভালোই ত', তবে একটু স্ট্রং।

সানন্দা বল্লে—আমি একটু স্ট্রং-ই পছন্দ করি। ভাল না লাগে ত' আর এক কাপ তৈরি করে দিচ্ছি।

—না না, মন্দ কি! আমি চা একটু কম খাই।

—সে বুঝতে পারছি, জীবনটা দেখছি নীরবেই কাটিয়ে দিলি। উনি আবার চায়ের চেয়ে কফিটাই বেশি পছন্দ করেন।

বাইরে মোটরের আওয়াজ পাওয়া গেল, সানন্দা তাড়াতাড়ি জানলার কাছে ছুটে গেল, বল্লে—নিশ্চয়ই হীরু সেন, যাস্ট ইন্ টাইম। কিন্তু গাড়িটা ভিতরে এসে দাঁড়াতেই আশাহত সানন্দা ক্ষুন্ন মনে ফিরে এসে বল্লে—নাঃ মিঃ পাকড়াশী এলেন। আজ একটু সকালেই ফিরলেন দেখছি।

নবাগতকে দেখবার জন্য জয়ন্তী অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠল,

সানন্দার উপস্থিতিতেই যে উনি এসে পৌঁছেচেন তার জন্য জয়তী অত্যন্ত স্বস্তি অনুভব করলো। সানন্দা উভয়কে একা ফেলে যাবার আগে অন্ততঃ পরিচয় করিয়ে দিতে পারবে। চায়ের পেয়ালাটি নামিয়ে রেখে জয়তী সানন্দার মত জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

জয়তী ছবির মত স্তব্ধ হয়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইল, সারা দেহের রক্ত প্রবাহ যেন তার মুখে ও গালে এসে জমেছে, জীবনে এ কি বিড়ম্বনা! এ কি ভীষণ আঘাত! জয়তী তাড়াতাড়ি জানলার লোহার গরাদে দু'হাতে শক্ত করে ধরল, তার আর দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, হয়ত সে এখনই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে, হৃদয়ের স্পন্দন ধ্বনি হয়ত সানন্দা শুনতে পাচ্ছে।

প্রকাণ্ড মোটার এসে বারান্দার নিচে দাঁড়িয়েছে, দরজা খুলে 'টুটুল' ধীরে ধীরে তার ভিতর থেকে নেমে এলেন. সেই টুটুল। গতরজনী থেকে এক মুহূর্তও যার কথা জয়তী ভুলতে পারেনি, সেই টুটুল! একি স্বপ্ন—না মায়া—না মতিভ্রম! টুটুল নিশ্চয়ই সানন্দার স্বামী নয়. লজ্জা ও কুণ্ঠায় জয়তী ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল, অদৃষ্টকে ধন্যবাদ, সানন্দা তার পিছনে বসে তার মুখাকৃতি লক্ষ্য করতে পারছে না। একটু আত্মস্থ হয়ে জয়তী প্রশ্ন করল—ইনিই রঞ্জিৎবাবু, মানে জামাই বাবু! সানন্দা অভিনয়ের ভঙ্গীতে বল্লে—এই সেই ভাগ্যবান! কিন্তু এমন সন্ধ্যাটিতে এঁর হাতে তোকে ছেড়ে দিতে আমি দুঃখিত, কিন্তু উপায় নেই।—আর কিছু নয়, বড় বাজে কথা বলতে ভালবাসেন।

জয়তী-চোখ দুটি বন্ধ করলো—বাজে কথা! টুটুলের কথা কোনোদিন তার কাছে বাজে কথা হয়ে উঠ্‌বে না। সানন্দা যদি জানত তাহ'লে কি ভয়ঙ্কর অবস্থাই না হ'ত। টুটুল এবং রঞ্জিৎ—এক

এবং অভিন্ন ব্যক্তি। ছিঃ ছিঃ সে কি নির্বোধ, এই সহজ তথ্যটুকু পূর্বাহ্নে অনুমান করতে পারেনি। কি করেই বা বুঝবে! তাহ'লে ইনিই সানন্দার স্বামী। এই স্বামীই সানন্দার মনোমত নয়, এই স্বামীকে একা রেখে সানন্দা তার পুরুষ বন্ধুদের নিয়ে সন্ধ্যা যাপন করে আনন্দ পায়—এই জন্যই টুটুল তার নিরানন্দ জীবনের কিঞ্চিৎ আভাষ তাকে দিয়েছিল,—গত রজনীর সব কথাই এখন জয়তীর কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেচে।

অতিকষ্টে হৃদয়-দৌর্বল্য সংযত করে জয়তী সানন্দার কাছে ফিরে এল। টুটুলকে একটু সতর্ক করতে পারলে ভালো হ'ত, কিন্তু তা সম্ভব হল না, এইখানেই চুপ চাপ থাকতে হবে যতক্ষণ না টুটুল এসে পৌছায়, তারপর তাকে এভাবে এখানে দেখলে টুটুলও নিশ্চয়ই জয়তীর মত বিস্ময়াহত হয়ে পড়বে।

সানন্দা আর এক পেয়ালা চা ঢেলে জয়তীর হাতে দিল, সানন্দাকে ধন্যবাদ, এই চায়ের পেয়ালা সাময়িক ভাবে বাহ্য আকৃতি গোপন রাখতে পারবে। পেয়ালাটুকু শেষ করতে যেন কত দীর্ঘ সময় কেটে গেল—টুটুল আর আসেনা।

অবশেষে সুইংডোর ঠেলে টুটুলের আবির্ভাব হল। জয়তীর সেই অতি পরিচিত দ্রুত অথচ লঘু পদক্ষেপ। প্রথমটা টুটুল জয়তীকে দেখতে পায়নি। সানন্দার দিকে চেয়ে উঠল—কি নন্দা! আজ কোন্ রাজ্য জয় করতে চলেছ,—ঠিক যেন হেডী লা মার! বেশ মানিয়েছে!

—রসিকতা ভালো, কিন্তু অতি রসিকতা ভালো নয়। সহরে যাব, হীরু সেনের ওখানে পার্টি আছে! এতক্ষণে চলেই যেতুম, ভালো কথা যাবার আগে আমার এই বোনটিকে তোমার সঙ্গে পরিচয়

করিয়ে দিই, ও এখন কিছুদিন এখানে থাকবে, ওকে যে আসতে লিখেছি সে কথা তোমাকে বুঝি বলিনি,—যাই হোক এই হ'ল জয়তী, ভারী ভালো মেয়ে, অর্থাৎ স্বদেশী করে, খদ্দর পরে ইত্যাদি ; জয়া ইনিই তোমার জামাইবাবু মিঃ পাকড়াশী !

জানালার পাশে কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল, রঞ্জিৎ পাকড়াশী তার দিকে এতক্ষণে তাকালেন, তারপর ভীষণভাবে চমকিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। জয়া! আশ্চর্য ও এখানে এল কি করে? সানন্দার বোন! এখানেই তাহ'লে ও আসছিল, আহা তখন যদি প্রশ্ন কর্‌তাম দিল্লীতে কোথায় আস্‌ছে ? এর কথাই ত' গত রজনীতে জয়তী তাকে বলেছিল ! সানন্দাটা কি—এই সংবাদটা আগে তাকে কিছুতেই জানায়নি ! এর চেয়ে আর বিচিত্র কি ঘটতে পারে? পৃথিবীতে এত সহস্র মেয়ে থাকতে কিনা স্ত্রীর দূর সম্পর্কের বোনের প্রেমে পড়তে হ'ল, একই বাড়িতে উভয়ে থাকবে প্রতিদিন উভয়ে উভয়কে দেখবে ! কি কাণ্ড !

রঞ্জিৎ জয়তীর দিকে চেয়ে রইল, নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করা যায় না।

অবশেষে জয়তীই এই সংকট ত্রাণ করলো—সে এগিয়ে এসে সহসা রঞ্জিৎ-এর পায়ে প্রণাম করলো—এ বাড়িতে এসব দেশী প্রথার পাট নেই, রঞ্জিৎ জয়তীর হাত দুটি ধরে তাকে উঠিয়ে দিল। এই আনুষ্ঠানিক পরিচয় বিনিময়ের সময়ে উভয়ের মধ্যে একটা নীরব প্রশ্ন বিনিময় হয়ে গেল।

কি অস্বস্তিকর অবস্থা ! এমন সময়ে বাইরে আবার একটি মোটরের উৎকট ইলেকৃট্রিক হর্ণ ধ্বনিত হল।

সানন্দা হ্যাণ্ডব্যাগটি টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বল্লে—নিশ্চয়ই হীরু

সেনের বংশীধ্বনি! চলি তাহলে! জয়া তুই ত' অনেক গল্প করতে পারিস—দুজনে গল্প কর,—So long—you two!

সানন্দা হরিণীর মতো দ্রুত পদক্ষেপে নেমে গেল, সন্ধ্যার সেই ধূসর অন্ধকারে জয়ন্তী আর টুটুল উভয়ে একাকী তেমনি নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

হীরু সেনের গাড়িখানি চলে যাওয়ার শব্দ বাতাসে মিলিয়ে যাবার পর টুটুল অর্থাৎ রঞ্জিৎ অপরাধীর মত ভীরু কণ্ঠে বল্লে--জয়া তুমি এখানে? অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস!

অপ্রতিভ জয়ন্তী বল্লে—এখানেই ত' আসছিলুম, এই কথাই তোমাকে বলেছিলাম, পরিহাসই বটে। আগে থাকতে এতটুকু আভাষ পেলে ধূলো পায়েই বিদায় নিতুম।

—সানন্দা যে তোমাকে এখানে আসবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছে একথা আমার জানা ছিল না, আত্মীয় স্বজনের কথা কদাচিৎ ওর মুখে শুনতে পাই, কাজেই আমি কিছু বুঝিনি!

—এখন কি করে আসন্ন বিপদের হাতে নিষ্কৃতি পাই, তাই ভাবছি। দেবা ন জানন্তি, আমরা ত তুচ্ছ মানুষ মাত্র, এখন ভাবছি এই সহজ কথাটা আগে কেন বুঝতে পারিনি, দিল্লীতে আসছ, কৌতূহল মেটাবার জন্যে যদি কার বাড়ি যাবে প্রশ্ন করতাম, তাহ'লে—

আর আমি যদি জানতাম সানন্দার রঞ্জিৎ পাকড়াশী আর টুটুলবাবু এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি!

জানা কঠিন, টুটুলকে আর কজন চেনে? রঞ্জিৎ পাকড়াশীকেই সারা শহরের লোক জানে, তোমার ত্রুটী সামান্যই!

নির্বাক জয়ন্তী টুটুলের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, জয়ন্তীর উজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে চেয়ে টুটুলের মনে হ'ল জয়ন্তীকে বাহুর

কঠিন বাঁধনে বেঁধে, গত রজনীর বিচ্ছেদের পর কি গভীর বেদনায় তার সমস্ত দেহমন ভঙ্গুর কাঁচের মত গুড়ো হয়ে গেছে সেই কথা জানায়। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কি দুঃসহ সংযম ও শক্তির তাড়নায় সে হোটেল থেকে পালিয়ে এসেছিল, কি ভাবে সারাদিন পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে সেই কাহিনী সবিস্তারে জয়ন্তীকে জানালে হয়ত মনোভার নামানো যেত। গত রজনীর ঘটনা যেন তার ভ্রান্ত মনোবিকার, নিছক স্বপ্ন-বিলাস, এই কথাই দিল্লীর কর্মক্লান্ত আবহাওয়ায় ভুলে যাবার চেষ্টাই টুটুল করত—কিন্তু জয়ন্তী যে এইখানেই এসে পড়বে সে কথা কি স্বপ্নেও ভাবা যায়। উপন্যাসের এই চঞ্চল্যকর উপসংহার পূর্বাহ্নে করা অসম্ভব। কিন্তু 'উপসংহার' কথাটির প্রয়োগ হয়ত তেমন সুষ্ঠু হ'লনা, টুটুলের মনে হ'ল, এ'ত উপসংহার নয়, এইত' সবে 'অবতরণিকা'।

টুটুল বল্লে—আমার জীবনের বোধকরি এই সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময়কর ঘটনা, আমার প্রকৃত নাম গোপন করার জন্য অবশ্য আমার অপরাধের গুরুত্ব কিঞ্চিৎ বেশি, কিন্তু তাতেই বা কি এমন প্রভেদ ঘটত—

জয়ন্তী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বল্লে—প্রভেদ বিশেষ ঘটত। আমি তা'হলে কিছুতেই আর এতদূরে আসতাম না।

—কিন্তু তোমার বোনের আহ্বান উপেক্ষা করা হ'ত, ভালোই হয়েছে যে তোমার কর্তব্যে বাধা ঘটেনি—তোমাকে এখানে থেকে না সরিয়ে দিয়ে আমি নিজেই না হয় সরে দাঁড়াই। এখানে আসার জন্যে তোমার আগ্রহ আমি লক্ষ্য করেছি।

—বাজে কথা বলে কোনও লাভ নেই, যেতে যদি কাউকে হয়—সে আমি। এটা তোমার বাড়ি—আমার নয়।

একথা টুটুলের কানে গেলনা, তার সুন্দর চোখ দুটি প্রগাঢ়

প্রীতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল, জয়তীর বিস্রস্ত চুলগুলি কপাল থেকে নিবিড় স্নেহভরে সরিয়ে দিতে দিতে টুটুল বল্লে—জয়তী তুমি আমার স্ত্রীর মাস্‌তুতো বোন, অথচ এমনই অবিশ্বাস্য কাণ্ড যে আমি তোমাকে কখনও দেখিনি বা তোমার কথা শুনিওনি, কিংবা শুন্‌লেও তা স্মরণ কর্‌তে পারিনা, এর চাইতে আশ্চর্য আর কি হতে পারে ? এর কারণ কি বল্‌তে পারো ? কি এর অর্থ !

আবেগ ও আকুলতাপূর্ণ টুটুলের এই কথা জয়তীর মনে যুগপৎ আনন্দ ও ভীতির সঞ্চার কর্‌লো, সে সভয়ে-পিছিয়ে এল, তারপর অত্যন্ত-ক্ষীণ-কণ্ঠে মুখে হাসির রেখা টেনে বল্লে,—না জানার সম্ভাবনাই বেশি। তার কারণ সানন্দার মা আর আমার মা দুইবোন হ'লেও, দুজনের মধ্যে প্রীতির চাইতে ঈর্ষার ভাগ-ই ছিল বেশি, কিন্তু এমনই আশ্চর্য কর্তাদের মধ্যে একটা গভীর ভালোবাসার বন্ধন ছিল। তাই কাছাকাছি হলেও উভয় পরিবারের ব্যবধানটি ক্রমশঃ বেড়ে উঠেছে। তা ছাড়া ঐশ্বর্য ও সম্পদের প্রাচুর্য সানন্দাদের তরফেই বেশি, ব্যবধানের সেটিও একটা বড় কম কারণ নয়। ছোট বেলায় তবু সানন্দাদের সঙ্গে আমার কিছু মেলামেশা ছিল কিন্তু বিয়ের পর এই আমরা সর্বপ্রথম মুখোমুখি এসে দাঁড়ালুম।

—তোমার সাহায্য তার কাছে হয়ত অপরিহার্য, সেই স্বার্থটুকুর খাতিরেই সে তোমাকে এখানে টেনে এনেছে, তোমার হাতে খুঁটিনাটির ভার ফেলে দিয়ে তার হয়ত আরো অবকাশ—আরো অবসর মিল্‌বে।

টুটুলের কণ্ঠে এই কথাগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে ধ্বনিত হ'ল, তার মুখে এমন কঠোর কথা জয়তী এই সর্বপ্রথম শুন্‌লো। তার মনে হল সানন্দার স্বপক্ষে তার কিছু বলা প্রয়োজন,—সে বল্লে, নিছক

স্বার্থের খাতিরেই হয়ত সে আমাকে ডাকেনি, এত বড় বাড়িতে সঙ্গীর অভাবে যে হাঁফিয়ে পড়তে হয়।

টুটুল তেমনই কঠিন কণ্ঠে বল্লে—ঠিকই বলেছ সঙ্গীর অভাব সানন্দার নেই, কিন্তু সঙ্গিনীর অভাব হয়ত এতদিনে পূর্ণ হল। নিঃশেষিত প্রায় সিগারেট্‌টি মাটিতে ফেলে দিয়ে জয়তীর মুখের দিকে তাকালো, আবার টুটুলের মুখের স্বাভাবিক রঙ ফিরে এল, জয়তীর দৃষ্টিতে কি সম্মোহন শক্তি আছে কে জানে। টুটুল সহজকণ্ঠে বল্লে—চলো লনে বসে এক পেয়ালা কফি খাওয়া যাক্, কেবল বাজে বকে চলেছি—

—কিন্তু আবার কফি! এদিকে যে সাড়ে সাতটা বেজে গেছে, ডিনারের টাইম হয়ে এল। জয়তী ইতঃস্ততঃ করে বল্লে।

একথায় টুটুল অট্টহাস্য করে উঠল, বল্লে—এ বাড়ির সব কিছু যদি ঘড়ি ধরে নিয়মিত চালাতে যাও জয়তী তাহ'লে তোমাকে হার মান্‌তে হবে। সানন্দা ও আমি ঘড়ি নামক ঐ বিশিষ্ট যন্ত্রটির কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই চলা ফেরা করি। তাছাড়া ডিনার দেরীতে হলেও চল্‌বে, কিন্তু কথা ত' দেরী সইবে না। অনেক অ-নে-ক কথা আছে। বারান্দায় চলো, আমি ওদের কফির কথা বলে দিচ্ছি।

—এই কিছুক্ষণ আগে সানন্দাব্র্যাণ্ড্ চা খেয়েছি, অতঃপর কফি, মন্দ নয়!

—সানন্দার চা? সানন্দার শ্লোগান আছে, 'চা ঠাণ্ডা মে গরম রাখতা, আর গরম মে ঠাণ্ডা!'

জয়তী এতক্ষণে সশব্দে হেসে উঠল।

লনের একপাশে প্রশস্ত রঙিন ছত্রতলে টেবিল চেয়ার সাজানো ছিল, জয়তী ধীর লঘুপদে সেখানে গিয়ে বসে জ্যোৎস্না প্লাবিত

বাগানটির দিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। যেন কি এক অস্বস্তিকর সর্বনাশ তার শ্বাসরোধ করতে বসেছে, আবার টুটুলকে ফিরে পাবার অপূর্ব উন্মাদনায় সে আত্মহারা হয়েউঠেছে। একি সর্বনাশের নেশা! এই মুহূর্তেই এই দুরন্ত আশা ও আনন্দকে নিষ্ঠুরের মত নিষ্পেষিত করে ফেলতে হবে। টুটুল বিবাহিত, সানন্দা তার স্ত্রী, এই ঘটনা-টুকুই টুটুল আর জয়তীর মধ্যে আরো বিস্তীর্ণ ব্যবধান রচনা করেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে টুটুল এসে পাশে বসল, তারপর গত রজনীর মত কথার স্রোত প্রবাহিত হ'ল, কথার পর কথা, কত কথা! উভয়ের মধ্যে সেই রহস্যময় অপরিচিতির অবগুণ্ঠনজাল এখন অপসারিত হয়েচে। সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেছে। খুব পরিষ্কার ও স্পষ্ট না হলেও টুটুল তাদের বিবাহিত জীবনের কাহিনী জয়তীকে শোনাচ্ছিল, কিভাবে এই বিবাহের পর তার জীবনের সুখশান্তি চিরদিনের মত অন্তহিত হয়েচে সেই কাহিনীর সবিস্তার বর্ণনা।

সানন্দার লঘুছন্দ দেহভঙ্গিমা, তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য টুটুলকে সম্মোহিত করেছিল। টুটুল তখন মনে মনে ভেবেছিল তাদের মিলনে একদিন এক নতুন আদর্শের সূচনা হবে। সানন্দার মত স্ত্রী—সানন্দা গৃহিণী, সচিব, সখী, প্রিয় শিষ্যা ললিত কলাবিধৌ, সানন্দার সন্তানের কলরবে 'মনজিল' মুখরিত হয়ে উঠবে। জগৎ সংসারের কিছু না কিছু হিতসাধন করতে পারব। অর্থের অভাব ছিল না, উত্তরাধিকার সূত্রে পৈত্রিক সম্পত্তি যথেষ্ট পাওয়া গেছে। কিন্তু তা হবার নয়, যা আশা করা যায় তা জীবনে কদাচিৎ ঘটে। বিবাহের পর ক্রমশঃই বোঝা গেল সানন্দার মন গৃহমুখী নয়, সংসারের বাঁধন তাকে বাঁধতে পারল না, ঘর, সংসার, মাতৃত্ব কোন কিছুর কামনাই তার নেই। উচ্ছৃঙ্খলের মত মুক্তহস্তে অকারণ অর্থব্যয়। নিত্য নূতন

আনন্দের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানোই তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিলাস পাঁচজনের সপ্রশংস হাততালি তার প্রধান কাম্য, সে জিনিষটিও বিনামূল্যে প্রচুর পাওয়া যায়। কারণ সানন্দা সুন্দরী ও শ্রীময়ী, তাই স্বামীকে দূরে সরিয়ে রেখে, নিজের খেয়ালের পিছনেই সে ঘুরে বেড়ায়। সানন্দা চরিত্রের এই কাঠিন্য টুটুলকেও কঠোর থেকে কঠোরতর করে তুল'ছে, সময় এবং অর্থ অকারণে ব্যয়িত হয়, প্রথমে তবু সহযোগীতা ছিল এখন দুজনে দুদিকে সরে গেছে, কারণ উভয়ের মধ্যে কোন কিছুরই সামঞ্জস্য হলনা।

কাহিনীর শেষে ম্লানকণ্ঠে টুটুল বল্লে—জানো জয়তী, আমি দুর্বল, আমি জানি জীবনকে আরো স্পষ্টভাবে গ্রহণ করার জন্য সানন্দাকে বাধ্য করা আমার কর্তব্য ছিল,—কিন্তু তা হ'ল না, আমি পরাজয় স্বীকার করলুম, সানন্দার অন্তরে আমার জন্য যখন এতটুকু ভালবাসা সঞ্চিত নেই তখন আমিও সসম্মানে সরে এলুম—তা নিয়ে বিলাপ করিনি। অসহায়ের মত শুধু অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছি। এই ভাবেই আমি সব কিছু উপেক্ষা করে চলেছি, কিন্তু ক্রমশঃ নিদারুণ শূন্যতায় মন ভরে উঠচে। একদিকে জনতা, অন্যদিকে নিভৃতি, যেন বিরাট অরণ্য। নিজেই দিন দিন লজ্জিত হয়ে উঠছি। নিজের অসার্থকতার লজ্জার বোঝা বহন করে চলেছি। এর জন্যে সানন্দাকে আমি দোষ দিই না দোষ আমার নিজের। গত রাত্রে তোমাকে দেখে বুঝেছি জীবনে কি হওয়া উচিত। শূন্য জীবন পূর্ণ করার ক্ষমতা সানন্দার নেই। যত তোমার অভাব অনুভব করেছি ততই বুঝেছি জীবনটা কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে—মনে মনে কেবল ভেবেছি জয়তী যদি আমার কাছে থাকত।

জয়তী হাত দুটি গালে রেখে একমনে টুটুলের কথাগুলি শুনছে, সমস্তই যে সত্য, এতটুকু অতিশয়োক্তি নেই, সেটুকু সে সহজেই

বুঝেছিল,—সানন্দা আপন আনন্দে আত্মহারা, "সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও"—এই তার জীবনাদর্শ। জয়ন্তীর মনে কষ্ট হ'ল,—কিন্তু ঠিক কি যে তার করা উচিত তা বুঝলো না। সে বলে উঠলো—

সবই বড় গোলমেলে বাও টুটুল,—না—না, এখন আর টুটুল নয়, রঞ্জিৎ বাবু-ই বলতে হবে।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে টুটুল বল্লে—সবায়ের কাছে রঞ্জিৎ—কিন্তু তোমার কাছে আমি টুটুল হয়েই থাকতে চাই জয়া!

—তোমাকে আমি অপর নামে ডাকতে পারি না।

—আমার চিঠি পেয়েছিলে?

—পেয়েছি, সেটিকে জীবনের সম্পদ হিসেবে সযত্নে রেখে দিয়েছি।

—কাপুরুষের মত পালিয়ে এসেছি, কিন্তু উপায় ছিল না।

—বুঝেচি।

—তুমি সবই বোঝ দেখচি, এতটুকু মাথায় তোমার কত বুদ্ধি জয়া! আমি কেবল ভাবছি তুমি হয়ত আমাকে ভণ্ড কাপুরুষ মনে করে অভিশাপ দিচ্ছ। আমি যে বিবাহিত এই কথাটি কিছুতেই তোমাকে সোজাসুজি জানাতে পারলাম না। কিন্তু সব চেয়ে মুসকিল হয়েছে যে তোমাকে আমি সত্যই ভালোবেসে ফেলেছি, এত স্পষ্ট করে বলার ফলে কথাটির গুরুত্ব নিশ্চয়ই কমে যাবে না, জয়া গত রাত্রের ঘটনা তুমি কি এইভাবে নিয়েছ?

জয়ন্তী উঠে দাঁড়ালো, তারপর মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে বল্লে—যা আশা করা যায় জীবনে তা ঘটেনা টুটুল! কিন্তু এখন আর এসব কথায় লাভ কি, অবস্থা যা দাঁড়ালো তাতে আমার সসম্মানে প্রত্যাবর্তন ভিন্ন আর পথ কৈ?

—তুমি যেওনা—যেওনা জয়া।

—আমাকে যেতেই হবে, দিনের পর দিন আমরা মুখোমুখি থাকতে পারবো না, তা ছাড়া সানন্দা গত রজনীর কথা জানে না সেই কারণেই আমার এখানে থাকা তেমন শোভন হবে না।

রঞ্জিৎ পাকড়াশীর ক্লান্ত মুখে আনন্দ রেখা উদ্ভাসিত হ'ল—সে বল্লে —জয়া তোমার যুক্তি আমি মেনে নিচ্ছি, কিন্তু সত্যি বলছি সানন্দা যদি জানতেও পারে তা হ'লেও সে কিছুই মনে করবে না, কারণ সে তার ভক্তদের স্তবগুঞ্জনেই আত্মহারা হয়ে আছে।

—কিন্তু রীতি হিসাবে তা মেনে নেওয়া যায় না, এর নাম যথারীতি বিবাহ নয়, বিবাহিত জীবনের কি এই আদর্শ!

তীক্ষ্ণ শ্লেষ ভরে টুটুল বলে উঠল—জানি জানি—সব জানি জয়া আমাকে আর আদর্শের কথা বোলো না।—তারপর হতাশা মিশ্রিত কণ্ঠে বলে উঠল, কিন্তু আমি নিরুপায়, একান্ত অসহায়!

—বুঝলাম, কিন্তু আমাকে চলে যেতেই হবে।

—কোথায়? কোনখানে যাবে? টুটুল বিমর্ষ হয়ে বল্‌ল।

—কোথায় যাব ঠিক তা নিজেই জানি না, কলকাতায় একটা কাজ আছে, হয়ত' সেখানেও যেতে পারি। এখান থেকে আমি চলে গেলে আমাদের উভয়ের তবু কিছু সুবিধা হওয়া সম্ভব।

রঞ্জিৎ ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে জয়তীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। পূর্ব আকাশ আগুনের মত লাল হয়ে উঠেচে, চাঁদ উঠবে, ইতস্ততঃ বিচরণ-শীল মেঘগুলি পাতলা ওড়নার মত সূক্ষ্ম মনে হচ্ছে, অজস্র গোলাপের গন্ধে বাতাস মদির হয়ে উঠেছে। গভীর বেদনা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে রঞ্জিৎ বল্লে—জানো জয়তী তোমাকে এখানে, মানে "মন্‌জিলে"

রাখবার জন্য আমার যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতে পারি। বাড়িতে ফিরেই তোমাকে দেখে কি যে আমার মনে হয়েছে, তা তুমি জানো না জয়া।

—এত প্রাচুর্য! এত আড়ম্বর! এখানে থাকবার বাসনা আমার ছিল টুটুল, কিন্তু এখানে থাকা যে কত অসম্ভব তা তোমার বোঝা উচিত।

টুটুল আবেগভরে জয়তীর হাত দুটি ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে বল্লে—বুঝি জয়া! কিন্তু শুধু আমার জন্যই তোমাকে যেতে হবে?

—হ্যাঁ! অতিকষ্টে জয়তী একথা উচ্চারণ করলে। উচ্চারণ না করেই বা উপায় কি! টুটুলকে ছেড়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব একথা সে কি করে জানাতে পারে। টুটুলকে ছেড়ে সে কোথায় গিয়ে সুখী হবে।

পরাজয়ের গ্লানি গায়ে মেখে নিয়ে রঞ্জিৎ বল্লে—বেশ, তাই হোক, কিন্তু কলকাতায় কিছু পাকাপাকি স্থির না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।

ক্ষীণকণ্ঠে জয়তী বল্লে—বেশ। কিন্তু সানন্দাকে কি বলব?

—কিছু বলার কি প্রয়োজন? সে হয়ত রসিকতা মনে করে তাচ্ছিল্যভরে হেসে উঠবে। আমাদের কথা নিয়ে কেউ উপহাস করুক তা নিশ্চয়ই তোমার কাম্য নয়।

জয়তীর মুখখানি লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠলো—কখনই নয়। টুটুল বল্লে—আমাদের এ প্রেমের কথা অনুচ্চারিতই থাক।

জয়তী অতিকষ্টে বল্লে—কিন্তু সানন্দা যদি গত রজনীর কথা জানতে পারে, তাহলে কি সত্যি—'

—অর্থাৎ তাহলে তা নিয়ে হৈ চৈ করবেনা, এই কথা ত'?

জয়তী মাথা নাড়ল।

—সন্দেহ সাপেক্ষ; বেশ আমরা তাকে জানতে দেব না, তবে সত্যি কথা বলতে কি, এখনই আমার অবস্থা এমন যে কোনো কিছুই আর আমি গ্রাহ্য করি না। আমি তোমাকে হাত ধরে সানন্দার সামনে নিয়ে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি সানন্দা আমি একে ভালবাসি। আমি তোমার কাছ থেকে মুক্তি চাই।

জয়তী মৃদুকণ্ঠে বল্লে—বলতে অবশ্য পারো, কিন্তু যেন একটু অতি-মাত্রায় নাটকীয় হয়ে পড়বে বলে মনে হচ্ছে।

টুটুল এবার অট্টহাস্য করে উঠল, তারপর জয়তীকে আরো কাছে টেনে এনে শ্রান্ত ভঙ্গীতে বল্‌লে—আমাকে তুমি ছেড়ে যেওনা জয়তী, বলো, কথা দাও—'

শেষের কথাগুলি আর আত্মহারা জয়তীর কানে পৌছল না।

এই মানুষটির কথার ইন্দ্রজালে জয়তী কিছুকাল দিশহারা হয়ে রইল। সানন্দার সেই কণ্ঠস্বর আবার তার কানে অনুরণিত হোল—

—"আমি দেখছি, তুই আজো সেইরকমই আছিস জয়া, কেবল তোদের কবিত্ব আর আর বড় বড় কথা।"

ইন্দ্রজালের আবরণ অপসারিত হ'ল। সহসা তার দুর্বল মস্তিষ্কে বিচার ও বিবেচনার এক তরঙ্গ প্রবাহিত হ'ল; সেই মুহূর্তে টুটুলকে আর 'রহস্যময় প্রেমিক' বলে মনে হয় না, রূপকথার রাজপুত্রের মত সুদূর কল্পলোকে নিয়ে যাবার ক্ষমতা টুটুলের নেই। সব ইন্দ্রজাল ভেদ করে মরুপরিচারণ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ধনী তনয়ের করুণ মুখখানি জয়তীর চোখে ভেসে উঠল। প্রচুর অর্থ, অজস্র সময়, অথচ প্রেমহীন বিবাহের ফলে টুটুল কোনও ক্রমে জীবনের ভার বহন করে চলেছে। তবু—তবু টুটুল সানন্দার স্বামী।

জয়ন্তী ক্ষীণকণ্ঠে বল্‌লে—সানন্দা ও তোমার ব্যবধান আরো দীর্ঘ করে তোলার জন্য আমি কি করে এখানে থাকি রঞ্জিৎবাবু?

এই অপরিচিত নামটি অতিকষ্টে জয়ন্তীর কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল।

—তুমি সানন্দার স্বামী, আমি যে কিছুতেই তোমার কাছে থাকতে পারিনা।

রঞ্জিৎ-এর চোখের সামনে বিশ্বজগৎ তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেল, মৃদুকণ্ঠে রঞ্জিৎ বল্‌লে—একথা তুমি বলবে তা আমি জানতাম জয়া। কি কঠিন তুমি, তোমার দৃঢ়তায় আমার ভয় করে।

—কিন্তু আমার কথা বুঝলে?

—অর্থাৎ তুমি চাও সানন্দা ও আমি আবার নতুন করে সংসার রচনা করি, কেমন তাই না?

বেদনাকুল কণ্ঠে জয়ন্তী বল্‌লে—সেইটাই কি শোভন ও সঙ্গত নয়?

টুটুলের মুখভাব মুহূর্তে পারবর্তিত হ'ল, তার মুখের সেই কমনীয়তা অন্তর্হিত হয়েচে, টুটুলের মুখে কঠিন হাসির রেখা ফুটে উঠল, শ্লেষ-মিশ্রিত এ হাসি—এ হাসি জয়ন্তীর কানে ভালো শোনালো না। টুটুল আর একটি সিগারেট ধরালো, তারপর বল্‌লে—একটা সত্যি কথা বলছি শোন জয়া, "সানন্দার দিক থেকে উৎসাহজনক সাড়া পেলেও আমি আর তাকে ভালোবাসতে পারবো না, কিছুতেই নয়, কারণ তোমাকে আমি দেখেচি। আর তা ছাড়া—তারই বা কি প্রয়োজন, অফুরন্ত আমোদের বন্যায় যে তলিয়ে গিয়েছে, আর সে উপরে উঠে আসতে রাজি হবে কি!"

জয়ন্তী করুণ গলায় বল্লে—বুঝি, সবই বুঝি টুটুল।

যে-জাতীয় বিবাহ টুটুলের মনোমত হতে পারত তা জয়ন্তী বোঝে। সংসার, গৃহ, সমাজ ও সন্তান, আর কল্যাণময়ী গৃহলক্ষ্মী, এই তার

জীবনের স্বপ্ন। জয়তী বোঝে সানন্দার মধ্যে নারী প্রকৃতির এই কল্যাণী মূর্তির অভাব আছে, ঘরের চাইতে বাইরের আকর্ষণ-ই তার কাছে বেশি। সানন্দার মধ্যে আদর্শ-গৃহিণীর মশলা নেই।

টুটুল বল্‌তে লাগল—তা ছাড়া সানন্দারও অসুবিধা হবে, যে-স্বামী স্ত্রীর বন্ধুবান্ধব এবং প্রমোদ তালিকার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেনা, সে স্বামী স্ত্রীর কাছে অনাবশ্যক ভার হয়ে উঠ্‌বে। তাছাড়া তাছাড়া—

বাধা থাকে ত' বলার প্রয়োজন নেই।—জয়তী বল্লে।

—না বাধা আর কি, এই হীরু সেন, যার সঙ্গে সানন্দা আজ চলে গেল, হীরু ও সানন্দার মধ্যে একটু প্রীতির লক্ষণ লক্ষ্য করেছি। দেখি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

জয়তী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে—কিন্তু এত কথায় আমার কি প্রয়োজন টুটুল? সানন্দার আইনে যা সচল আমার কাছে তা অচল। তবে এইটুকু বুঝছি যে সানন্দাকে জানিয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব আমাকে অন্যপথে পাড়ি দিতে হবে, শুভস্য শীঘ্রং।

জয়তীর কুণ্ঠাবনতঃ মুখখানির দিকে টুটুল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, জয়তীর শুভ্র কণ্ঠে আলো এসে পড়েছে, মুখখানি ভালো দেখা যায় না। সহসা টুটুলের মনে বিশ্রী রাগ হল, সকলের ওপর অকারণ ক্রোধ, জয়তী, সানন্দা, অদৃষ্ট!

উত্তেজিত টুটুল বল্লে—তোমার কথাই হয়ত সত্যি জয়তী, তোমার পাশে সানন্দাকে মানায় না, তুলনা করতে চাইনা, দুজনকে পাশাপাশি দেখলে আমার যন্ত্রণা বাড়বে। তবে একথা মন থেকে ভুলে যাও, সানন্দা ও আমার মধ্যে আর কোন নতুন বন্ধন সম্ভব নয়, আমি সানন্দার পদতলে একান্ত অনুগতের মত বসতে পারবো না। চেষ্টা

করলেও তা সানন্দা স্বয়ং অনুমোদন করবে না। আমারও একটা মতবাদ আছে, আদর্শ আছে. তবে আমার অদৃষ্ট দোষে ঠিক তোমার মত নৈষ্ঠিক ভাবে তা পালন করতে পারিনা।

এ কথায় জয়তীর রাগ হ'ল টুটুলের মুখের দিকে তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বল্লে—আমার আদর্শ নিয়ে কি তুমি উপহাস করতে চাও? জীবন তোমার কাছে কষ্টকর এবং দুর্বহ মনে হতে পারে. সেই কষ্ট আর আমার জীবনের সুখ, দুঃখ, কষ্টের পরিমাণের তুলনা করে শুধু এইটুকু বলতে চাই, যে আমাদের দুর্দশাটা ঠিক এক জাতীয় নয়। আমার পক্ষে তোমার প্রস্তাব উপেক্ষা করা যে কতখানি কষ্টকর, কত দুঃসাধ্য, তা তুমি কিছুতেই বুঝবে না টুটুল—আমার জীবনে তোমার মতো আর কারো আবির্ভাব ঘটেনি।—তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে—কিন্তু তুমি সানন্দার স্বামী। আর সানন্দা আমার বোন, আমি তার বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছি। যতক্ষণ আমি এখানে থাকবো সেই কথা আমাকে মনে রাখতে হবে। এখন বুঝি, কি ভুলই না আমি করেছি।

এই উচ্ছ্বাসে জয়তী ও টুটুল উভয়েরই মনোভার অনেকখানি লাঘব হল। টুটুল জয়তীর কথা বুঝ্‌লো, তার রাগ সহনীয়, কিন্তু অশান্ত চোখের জল সহ্য হয় না। ত্বরিতে জয়তীর হাতদুটি ধরে টুটুল কোমল গলায় বল্লে—ও কথা বোলোনা জয়া, আমাকে তুমি ঘৃণা কোরোনা, গত রজনীর কথা ভুলে যাও. আমারই দোষ এখন বুঝি, তুমি যা বলেছ তা যে কতখানি সত্যি আমি বুঝেছি। আমার দুঃখের বোঝা আর বাড়িওনা, তুমি আমায় ক্ষমা করো। সব ভুলে গিয়ে আমাদের বন্ধুত্বের বাঁধন দৃঢ় হয়ে থাক—ভালোবাসার দাবি যদি নাই থাকে, বন্ধুতার দাবি তুমি উপেক্ষা কর্‌বে কি করে?

টুটুলের হাত দুখানি সজোরে নিজের মুঠির ভেতর চেপে নিয়ে জয়তী নীরবে মাথা নাড়ল। তার চোখ দুটী জলে ভরে উঠেছে, তারপর সহসা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শাড়ির প্রান্তে চোখ মুছে বল্লে—আর নয়, ডিনারের সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তুমি শ্রান্ত, আর দেরী করা উচিত নয়, আমি কিন্তু থাকতে পারিব না, শরীরটা ভালো নেই, একটু বিশ্রাম চাই। আর যেন দাঁড়াতে পারচি না সোজা গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নেব।

টুটুল তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করল না, জয়তীর মত টুটুলের মনে এতটুকু শান্তি নেই, টুটুল বুঝল এখন দুজন মুখোমুখি বসে সন্ধ্যাযাপন করার অর্থ দুঃখ আরো গভীরতর করে তোলা।

জয়তী তার ঘরে পৌছে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল, দুচোখ বেয়ে অশ্রুর প্লাবন প্রবাহিত। দাসীরা খাবার দিয়ে গেল, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করার মত মানসিক অবস্থা জয়তীর নয়। জয়তীর চোখের জলের আর শেষ নেই, কারণ জয়তী সমগ্র দেহমন দিয়ে এই কথাটাই বুঝেচে যে-নিতান্ত অসহায়ের মতো সে টুটুলের প্রেমে আত্মহারা হয়েচে। জয়তী কাঁদলো, কারণ সে বোঝে টুটুলকে সে কোনোদিন ঘৃণা করতে পারবে না, কিছুতেই মন থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না, সে যাই করুক, জয়তী চিরদিনের মত এই মানুষটির কাছে আত্মসমর্পন করেছে, তার নিষ্কৃতি নেই। জয়তী নিজেকেই প্রশ্ন করে—এ সব কথা বিচার করার কি অধিকার তার আছে, কে সে? সানন্দ ও টুটুলের জীবনধারা শুধু যে জয়তীর কাছে বিচিত্র, তা নয়, এ তার কল্পনাতীত। এরা বিত্তশালী এবং ভ্রষ্ট। এরা কোনোদিন এতটুকু পরিশ্রম করেনি, সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি এদের নেই, উভয়ের জন্য এতটুকু

পারস্পরিক স্বার্থত্যাগ নেই। বৃন্তহীনের মতো শ্লথ অসংলগ্ন গতিতে এই প্রেমহীন বিবাহিত দম্পতি আলোকলতার মত জীবন কাটাচ্ছে। বাইরের ঔজ্জ্বল্যে চোখ ঝল্সায়, ভিতরে এতটুকু দাহ নেই।

জয়তীর বোধ হ'ল, আর যাই হোক সানন্দার অন্য একটা দিক আছে। সানন্দা উত্তেজনাময় মধুর জীবন স্বপ্নে বিভোর, তার নিজস্ব ধারা আছে। তার কারণ সে চিরদিন ওপর দিকেই ভাসমান, তলদেশ সম্পর্কে অচেতন, সেখানে তার যোগাযোগ নেই। কিন্তু টুটুলের ভিতর অনেক কিছু আছে—রঞ্জিৎকে জয়তী টুটুল ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। টুটুল কিন্তু এই আবহাওয়ায় হাঁফিয়ে উঠেছে, সে প্রাণ চায়, আলো চায়—নূতন জীবনের ছন্দ তাকে হাতছানি দেয়। জয়তীকে নিয়ে নীড় রচনা করা চলে, জয়তীই পারে মাটির ধরণীতে স্বর্গ রচনা করতে। জয়তী হয়ত সানন্দে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত টুটুলের সঙ্গে ছায়ার মত অনুগামিনী হয়ে থাকতে পারত, কি প্রয়োজন ঐশ্বর্যের? কি প্রয়োজন এই প্রাচুর্যের? বেদিয়া রমণী যেমন তার প্রেমিককে অনুসরণ করে চলে, শুধুমাত্র প্রেমের আকর্ষনেই জয়তী তেমনই টুটুলের জন্য সকল সুখ, ঐশ্বর্য অস্বীকার করে দুঃখকে বরণ করে নিতে পারত। কিন্তু তা হয় না—কি নিদারুণ ট্রাজেডি!

জয়তীর অনেক বাধা, মেজদার কাছে কথা দেওয়া আছে, আগামী আন্দোলনে সে প্রাণ পর্যন্ত দিতে কুন্ঠিত হবেনা, আনন্দমঠখানি বার বার করে পড়ে সে জেনেছে জীবন তুচ্ছ, সকলেই জীবন ত্যাগ করতে পারে, চাই ভক্তি। ডাক যখন আসবে, তখন তাকেও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, তখন কোথায় থাকবে এই "মনজিল", কোথায় টুটুল, আর কোথায় জয়তী।

বহুক্ষণ চিন্তার পর জয়ন্তী স্থির করল, 'মন্‌জিল্' ছাড়তেই হবে, পার্টির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় ব্যবস্থা করতে হ'বে। আজ এই রাতেই এই মন্‌জিল ছেড়ে চলে যেতে পারলে ভালো হয়, দিনের পর দিন এই ভাবে টুটুল-সান্নিধ্যে থেকে, তিলে তিলে, পলে পলে প্রদীপ শিখার মত জ্বলে পুড়ে ছাই হতে সে পারবে না। কিন্তু টুটুলের কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অন্ততঃ কিছু একটা স্থির না হলে সে এখান থেকে সহজে নড়বে না।

আজ রাতে জয়ন্তী পরিশ্রান্ত, নানা চিন্তার জটিল সমাবেশ, মাথা ভারাক্রান্ত, আজ রাতে আর কাগজ কলম নিয়ে সে চিঠি লিখ্‌তে বস্‌তে পারবে না। আজ আর সে কিছুই ভাবতে পারবে না। আজ তার চিত্ত রিক্ত। কালই সে কল্‌কাতায় চিঠি লিখ্‌বে, পার্টির বন্ধুদের সংগে আলোচনা করবে, প্রয়োজন হলে কল্‌কাতাতেই যাবে। এখানে তার কিছুতেই চল্‌বে না।

সেই রাতে বহুবার জয়ন্তীর মনে হ'ল, টুটুলের কাছে সে পার্টির কথা সম্পূর্ণ চেপে রেখেছে। এখনই একবার গিয়ে সব কথা বলে ভারমুক্ত হয়। কিন্তু সে ভাবাবেগ কোন রকমে প্রতিরোধ করতে হ'ল, পার্টির গোপন কথা কাউকে জানাবার অধিকার তার নেই।

রাত অনেক হয়েছে, দূরে গির্জার ঘড়িতে বারোটা বেজে গেল। এ রাতেও জয়ন্তীর চোখে ঘুম নাম্‌ছে না। জয়ন্তী ধীরে ধীরে উঠে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালো। জয়ন্তী দেখ্‌লে, টুটুল নীচের 'স্যুইমিং পুলে'র দিকে চলেছে, এই রাতে আবার স্নান করতে। তারও চোখে হয়ত ঘুম নেই। কাঁধে তোয়ালে ঝুলছে, দেহে "স্যুইমিং কস্ট্যুম্"। এখান থেকে জল দেখা যায় না, তবে জলের আওয়াজ কানে আস্‌ছে—টুটুল জলে সাঁতার কাটছে, কল্পনানেত্রে তা বোঝা

যায়। তারুণ্য ও মাধুর্যের কি মনোরম সমাবেশ। যদিও কোনো-দিন আপন করে পাওয়া যাবেনা, তবু সে যে তারই, যে কোনো মুহূর্তে তাকেই সে পেতে পারে, এই কি কম কথা।

জয়তী আবার ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল, অশান্ত অস্থির-ভাবে বিছানার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যায়ক্রমে গড়াতে লাগ্‌ল, তবু কি চোখে ঘুম আসে, অসংখ্য চিন্তা একই সঙ্গে একই মুহূর্তে এসে মনের কোণে ভীড় জমিয়েছে, এখনই তারা তাদের প্রশ্নের উত্তর চায়।—কি উত্তর দেবে জয়তী, কি তার বলার আছে। সহসা দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল। জয়তী উঠে বসল, হৃদ্‌পিণ্ডের আওয়াজ নিজের কানেই যেন সশব্দে এসে বাজ্‌ছে। টুটুল ডাক্‌ছে—

—জয়া, জেগে আছ?

—হ্যাঁ।

—কয়েকটা কথা ছিল!

—কি কথা?

—তোমার সাহস দুর্জয়, ভাব্‌ছি তোমার মত সাহস যদি আমার একবিন্দুও থাকৃত। তুমি আমায় অনেক কিছু শেখালে। আমি একথা ভুল্‌বো না, তোমাকেও না। আচ্ছা—আসি। ঘুমোও।

জয়তী চুপ করে কথাগুলি হজম করল, তারপর অতিকষ্টে বল্‌ল—তুমি কি শুতে যাচ্ছ? দিদি ফেরেনি?

মৃদু কণ্ঠে টুটুল বল্‌লে—তুমি বলেছ তাই—সানন্দা সম্পর্কে যা বলেছ সেই চেষ্টাই করা যাবে। আচ্ছা আসি।

আর কোন সাড়া নেই, টুটুল চলে গেছে। জয়তীর হৃদয় স্পন্দন ক্রমে কমে এলো। বালিশটাকে বুকে চেপে, তাইতে মুখ লুকিয়ে জয়তী কিছুক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল। সহসা তার মনে

সানন্দা সম্পর্কে তীব্র ঈর্ষার সঞ্চার হ'ল, বন্য বিদ্বেষ। সানন্দা টুটুলের স্ত্রী, সানন্দা সম্পর্কে টুটুল বিবেচনা করবে, অর্থাৎ তাকে নিয়ে সুখী হবার চেষ্টা করবে। জয়তী নিজেও তাই চেয়েছে, টুটুলকে সেই অনুরোধই জানিয়েছে। এই ত একমাত্র গন্তব্য পথ। কিন্তু জয়তী চরিত্রের মানবীয় অংশটুকু তার অন্তরে তীব্র বিদ্রোহের সূচনা করেছে, সানন্দাকে টুটুল বুকে জড়িয়ে নেবে, এ কথা এই মুহূর্তে জয়তী আর ভাব্‌তে পারল না।

জয়তী ভাবতে লাগ্‌ল "মন্‌জিলে" তার আবির্ভাব মাত্রেই সানন্দার চলে যাওয়ার কি অর্থ হ'তে পারে? এর সমর্থনে কি বলবার আছে।

এখান থেকে চলে যাওয়ার সকল ব্যবস্থা স্থির করে তবেই সানন্দাকে বলা হ'বে, তার আগে নয়। সানন্দা মনে করবে জয়তী একটা অকৃতজ্ঞ মূর্খ। তার দয়ার সদ্ব্যবহার কর্‌তে পারলে না।

কিন্তু সানন্দাকে সে কিছুতেই কোনো কথা বল্‌তেও পার্‌বে না।

পরদিন প্রাতে দাসী চাকর ওঠার আগেই জয়তীর ঘুম ভাঙলো। জয়তী এ সংসারে ঠিক অতিথি হয়ে আসেনি, এসেছে কাজে। তাই প্রাতঃকৃত্য সেরেই ফুল বাগানে নেমে এসেছে টেবিলের ফুল সংগ্রহ করতে, কর্তব্যে ত্রুটি হওয়া উচিত নয়। দাসীদের কাছে আগেই সে জেনে নিয়েছে তার পূর্বতনী কি কি কাজ করতেন, মনে মনে তার তালিকা করে রেখেছে। বাড়ির পুরাতন দাসীর নাম "মাইয়া"— "মাইয়া" তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, নতুন দিদিমনির সঙ্গে আলাপ জমাতে। তার কাছেই জানা গেল সানন্দা গভীর রাতে ফিরেছে, সকালে তাকে ডাকবার হুকুম কারো নেই। এখনও শুয়ে আছে। আর সাহেব ভোরে উঠেই বেড়াতে বেরিয়েছেন।

মাইয়া একটু বেশি কথা বল্‌তে ভালবাসে৽ সাহেবের কথায় তার উচ্ছ্বাসের আর সীমা নেই, সাহেবকে কি সুন্দর দেখতে, আগে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেতেন, ইদানীং আর ঘোড়ায় চড়ছেন না, ঘোড়-সওয়ার সাহেবকে দেখলে মনে হয় যেন রাজপুত্র, মেজাজও তেমনি শরীফ। ফুলদানিতে কয়েকটি লাল গোলাপ সাজাতে সাজাতে জয়তী এই উচ্ছ্বাস শুনছিল, বেশ লাগে শুন্‌তে। জয়তী ভাবে :

—তাহলে টুটুলও ভোরে উঠেছেন, হয়ত আমার মতই বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন, কে জানে ?

দশটার আগে সানন্দা বা টুটুল কারো সঙ্গেই দেখা হ'ল না। সানন্দার মহলে যেতে জয়তী টুটুলের গলা শুনতে পেল, সানন্দার শয়নকক্ষে টুটুল কথা বল্‌ছে, জয়তী কি করবে এই ভেবে ইতঃস্তত: করতে লাগল, সানন্দার কণ্ঠ ঝঙ্কৃত হল :

—তুমিও যে দিন দিন 'ফুলে'র মত কথা বল্‌তে সুরু করলে, আমি হীরুর সঙ্গে বেরোই কি চৌধুরীর সঙ্গে ডিনারে যাই, তাতে তোমার কি ক্ষতি বৃদ্ধি ? আমার বন্ধু-বান্ধবদের আচরণ সম্পর্কে সতর্ক হ'তে তোমার একটু দেরী হয়ে গেছে, এতদিন পরে এ সব আবার কি কথা !

টুটুল মৃদু গলায় জবাব দিল···

—এইবার কি আমাদের থামবার সময় আসেনি, বুঝে নিতে হবেনা কোথায় আছি, কি চাই ? চিরদিনই কি এই ভাবে ভেসে ভেসে বেড়াব আমরা, এতদিনেও কিনারায় এসে তরী বাঁধবার সময় হয়নি ? বাড়িতে এসে তোমার চাইতে দাসী চাকরদেরই আমি বেশি দেখতে পাই।

—বেশ ত কবিত্ব হচ্ছিল, তরী, কিনারা, কি ভাগ্যিস্ ঐ সঙ্গে চাঁদটাও জুড়ে দাওনি। দেখ টুটুল তোমার আমার বিভিন্ন বন্ধু বান্ধব, নিজেদের মানামত বন্ধু আমরা বেছে নিয়েছি, এতদিন কোনো বাধা দাওনি, আজ হঠাৎ তাদের ওপর ঈর্ষান্বিত হয়ে লাভ কি? তোমার অসংখ্য বন্ধু—আমি ত' তোমার বন্ধুদের সম্পর্কে কোনোদিন কোনো ইঙ্গিত করিনি।

—কিন্তু এ কথা কি কোনোদিন তোমার মনে হয়েছে, আমি আরো কিছু চাই, পরিপূর্ণ ভাবে তোমাকে পেতে চাই, মানে তুমি আর আমি।

এ কথা শুনতে শুনতে জয়তীর মুখ লাল হয়ে উঠ্ল, তার মনে হল এখান থেকে এখনই চলে যাওয়া উচিত, কিন্তু মাটিতে তার পা যেন বসে গেছে, সে একবিন্দুও নড়্তে পারলনা। টুটুলের জন্য দুঃখ হয়, বেচারা টুটুল। কিন্তু সানন্দা, কি নির্লজ্জ, কি হৃদয়-হীন, স্বার্থপর। এর পর সানন্দার যে উত্তর এল তার ফলে জয়তীর সারাদেহের রক্ত যেন মুখে এসে জম্ল, চোখের কোন সজল হয়ে উঠ্ল-সানন্দা বল্ছে:

—বেশত একা একা ভালো লাগেনা বলেই ত' জয়াকে আনিয়েছি, তোমারই সঙ্গী হয়ে উঠ্বে, তোমারই ত' লাভ।

জয়তী চলে যাচ্ছিল, কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেল, ঠিক এই সময়েই টুটুল সানন্দার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, মুখটি পাংশু হয়ে গেছে, বিশেষ চঞ্চল বলে মনে হ'ল, কিন্তু তবুও কি সুন্দরই তাকে দেখাচ্ছে, আজ হঠাৎ টুটুল গান্ধীটুপি পরেছে, ঐ দীর্ঘ দেহে শুভ্র গান্ধীটুপি-চমৎকার মানিয়েছে। জয়তীর পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় টুটুল শুধু তীক্ষ্ণ অভ্রভেদী দৃষ্টিতে জয়তীর দিকে একবার তাকাল।

বল্লে—হয়ত শুনেছ, সানন্দা চায় তুমি আমার সখী হয়ে উঠ্‌বে, আর তুমি চাও আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া, অদৃষ্টের পরিহাস!

অসহায়ের ভঙ্গীতে জয়তী মাথা নাড়্‌ল। টুটুল চলে গেল—ঘর থেকে সানন্দা মধুর করে বলে উঠ্‌ল। জয়া নাকি! শোন্ ভাই—

জয়তী নিঃশব্দে শয়ন কক্ষে পৌঁছল। সানন্দা তখন প্রভাতী চা পান কর্‌ছে, স্নান সারা হয়েছে একটি পাত্‌লা ক্রেপের সাড়ি অসংবৃত ভাবে পরেছে, যেন শাড়ির ওপর করুণা করেই তা-পরা হয়েছে, কপালে আধুলীর পরিমাপে একটা গোলাকার সিঁদূর টিপ, এই তার প্রসাধন; বিছানায় সংবাদ পত্র আর কয়েকটি চিঠি ছড়ান রয়েছে, সানন্দার পোষা পিকিনিজ কুকুরটি বিছানার উপরেই কুণ্ডলী-কৃত হয়ে নীরবে শুয়ে আছে, সানন্দাকে মনোরম, শ্রান্ত এবং উত্তেজিত দেখাচ্ছে। জয়তী গম্ভীর ভাবে তাকে দেখ্‌তে লাগল, ভাব্‌লে এমন যে সুন্দর, এমনই যার রূপমাধুরী, অন্তরে কেন সে এত কঠোর, এত নিষ্ঠুর।

সানন্দা বল্লে—এসেছিস ভালো হয়েছে ভাই, টুটুলের মেজাজ আজ ভীষণ খারাপ। সকালটা নষ্ট করে দিয়ে গেল, বস্ একটু কথা কয়ে বাঁচি।

জয়তী মনোহর কিছু বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু কথা গলায় যেন আট্‌কে গেল, জয়তী কিন্তু একটা প্রশ্নের লোভ সংবরণ কর্‌তে পার্‌ল না।—বল্লে:

—মেজাজ হঠাৎ খারাপ হ'ল কেন দিদি?

—আমার কথার ভিতর এসে গোলমাল করা আমি পছন্দ করিনা জয়া, ভালো মন্দ বিচারের আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে,—এইটুকু বলে সানন্দা একটি বালিসে হেলান দিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গীতে শুয়ে পড়্‌ল।

জয়তী শাড়ির আঁচলে আঙ্গুল জড়াতে জড়াতে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল. কি আর বল্‌বে, বলার কি আছে? জয়তীর অত্যন্ত অসহায় ও অসচ্ছন্দ বোধ হতে লাগ্‌ল। সানন্দাকে কত কথা বলার ছিল কিন্তু কিছুই বলা গেল না।"

সানন্দা আবার বলে উঠ্‌ল—একটা কথা জয়া, ক্রমশঃই জানতে পার্‌বি, চেপে রেখে লাভ কি, তোমার এই জামাই বাবুটির সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। এমন সব উদ্ভট কথা বলে মাঝে মাঝে।

জয়তী মাটির দিকে চোখ রেখে ম্লান কণ্ঠে বল্লে—কেন যে এমন হয়!" এ ছাড়া আর কি সে বল্‌বে। কি বলা যায়।

সানন্দা একটু হেসে বলে উঠ্‌ল—সেই কথাই ত' ভাবি। আমার মনে হয় টুটুলকে তোর ভালো লাগ্‌ছে, লাগ্‌বারই কথা, সকল স্ত্রীলোকেরই ভালো লাগে, কিন্তু এমনই সব আইডিয়ালের বোঝা নিয়ে উনি ব্যস্ত যে দুদিন পরেই বুঝবি—কোনো স্ত্রীলোকই এমন পুরুষকে নিয়ে সুখী হতে পারে না, ও নিজেও কোনোদিন সুখী হবে না।"

আমার ত কিন্তু এ কথা মনে হয়নি, বেশ সহজ ও সরল বলে মনে হয়েছে,—জয়তী মৃদু গলায় জানালো।

সানন্দা বিলাতী কায়দায় কাঁধ নেড়ে বল্‌লে—হয়ত আমারই দোষ, আমি ও সব পারি না—ঘর সংসার আমার ভালো লাগেনা, কালই ত তোকে বললুম। ও সব মামুলী সংসার ধর্ম প্রতিপালন আমার সয় না। টুটুল এমনিতে বেশ লোক, বেশ আছি, কিন্তু যখন সংসারী হবার ভূত ঘাড়ে চেপে বসে যেন আর আমার সহ্য হয় না।"

জয়তী কোনো উত্তর দিল না; হয়ত তীক্ষ্ণ এবং কঠিন কিছু এর জবাবে বলা যেত কিন্তু এক্ষেত্রে চুপ করাই শ্রেয়। জয়তী বুঝ্‌তে পারল টুটুলের কথামত অবস্থা সত্যই আশাজনক নয়।

সানন্দা সহসা প্রশ্ন করল—কাল টুটুলের সঙ্গে কেমন কাটল? জবাব জয়তীর কণ্ঠে আটকে গেল, অতি কষ্টে সে বল্ল—ভালোই—

সানন্দা বল্লে, তুই আমায় বাঁচিয়েছিস, অনেক দিক দিয়েই আমার বিশেষ সুবিধা হবে।

জয়তী কোনো মন্তব্য করল না, তবে মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালো যেন শীঘ্রই সে এই অভিশপ্ত পুরী ত্যাগ করতে পারে।

সানন্দা জয়তীর করণীয় কতকগুলি কাজের একটি তালিকা বলে গেল। জয়তীর ব্যবস্থাবলীর প্রশংসায় সানন্দা পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, তারপর জয়তী ঘর ছাড়বার আগেই হঠাৎ উঠে কতকগুলি নতুন ধরণের শাড়ি ও ব্লাউজ এনে জয়তীকে উপহার দিল, সে নাকি এ সবের চাপে হাঁপিয়ে উঠছে। নিরাভরণ জয়তীর খদ্দর শোভিত দেহের শ্রী তেমন বিকশিত হচ্ছেনা। হয়ত এই বোনটির ওপর তার মমতা জেগেছে, চরিত্রে ও ব্যবহারে উভয়ের মধ্যে এতটুকু মিল নেই, আর শ্রদ্ধা না থাকলেও জয়তীও সানন্দার ওপর আকৃষ্ট হয়েছে। —তবে টুটুলের মত ভাবাবেগ প্রধান ব্যক্তির ওপর সানন্দার মত মেয়ের কি ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে তাও জয়তী বিবেচনা করল।

দুপুরে সানন্দা বাড়িতে খাবেনা, বাইরে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ আছে, টুটুলের সঙ্গেই জয়তীকে খেতে হ'ল, জয়তীর কাছে একটু অস্বস্তিকর ঠেকলেও মনে মনে সে একটা গোপন পুলক অনুভব করল। টুটুল গম্ভীর ও বিষণ্ন, হয়ত সকালের নিষ্ফল আপোষ প্রচেষ্টার জন্যই তার মনের কোনে মেঘ জমেছে।

চাকরদের উপস্থিতিতে টুটুল অত্যন্ত গম্ভীর ভাবেই রইল।

জয়তী তাতে প্রথমটায় ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, পরে সে ভেবে পায় না, এই আহত অভিমানের কোনো হেতু আছে। আহারের শেষ পর্যায়ে টুটুল বল্‌ল,—জয়া, অতঃপর কি তোমার প্রোগ্রাম?

জয়ার আনন্দাবেগের অভিব্যক্তি গালের রক্তিম বর্ণচ্ছটায় পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌লে যাই, আমাকে এবার উঠ্‌তে হবে, কতকগুলো হিসেব পড়ে রয়েছে—

টুটুল অট্টহাস্য করে উঠ্‌ল—বিবেচক মেয়ে বটে! সংসারে বেশ মেতে গেছ দেখ্‌ছি! কথাটা পাশ কাটিয়ে জয়তী পুনরায় একটা সাংসরিক প্রশ্ন করল—রাতে কি বাইরে ডিনার আছে?

—সেই বুঝে রান্না হবে, না আমার সান্নিধ্য থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, কি হিসাবে এই প্রশ্ন?

—এটা শ্লেষ না তিরস্কার বুঝছি না! তুমি ভারী নিষ্ঠুর!

—সানন্দা ঠিক অর্থ করত, হয়ত বল্‌ত, শ্লেষ নয় কটুক্তি, সত্যি আমি ভারী নিষ্ঠুর নয়?

—না—না—এ আমি এমনই বলেছি, তোমার মন আমি জেনেছি' অন্তরে তুমি ফুলের মত কোমল।

সহসা টুটুলকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও স্নেহময় মনে হ'ল—টুটুল হেসে বলে উঠ্‌ল—আগেও তুমি একবার কিছু বলেছিলে, অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, তবু একজনও প্রশংসা করে। হয়ত তোমার কথা ঠিক, হয়ত কিছু ভালো আছে আমার অন্তরে—কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ তা ধর্‌তে পারেনি! যদি আমার অন্তরের কথা তোমাকে বল্‌তে পারতুম, যদি কোনোদিন তোমার কাছে হৃদয় দ্বার মুক্ত করতে পারতাম, তাহ'লে—

তারপর একটু থেমে পুনরায় টুটুল বল্‌ল—

—কিন্তু তোমাকে এসব কথা বলে লাভ কি। তোমাকে এই কথা বলাও যা, আর সানন্দাকে সংযত হ'তে বলার ইঙ্গিত করার অর্থও তাই।"

জয়তী টুটুলের মুখের দিকে চেয়ে রইল, অন্তরে তার অত্যন্ত অস্বস্তি। সুন্দর আয়ত দুটি চোখ মেলে টুটুল একবার জয়তীকে পরিপূর্ণ ভাবে লক্ষ্য করল; তারপর আবার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল—

—সানন্দা, আজ সন্ধ্যায় থাকবে নাকি!

জয়তীর হৃদয় বেদনায় স্পন্দিত হ'ল, টুটুলের দীর্ঘায়ত দেহটির দিকে জয়তী চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—দিদি বাড়িতে থাকবেন, আজ সন্ধ্যায় কম্‌রেড চৌধুরী আসছেন, ডিনারে।"

—কমরেড চৌধুরী অর্থাৎ সেই পায়জামা ও জওহরলালী কোট, তাহ'লে আর বাড়ি থাকা চলেনা। এই কথা বলেই টুটুল তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জয়তী টুটুলের বেদনা বুঝল, কি ক্লান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত তার মনোভংগী, এই হৃদয়দাহের জন্য দায়ি সানন্দা—সানন্দা টুটুলকে পাগল করে তুলেছে, পাগলের চাইতে কোন অংশেই বা কম—জয়তীর মনে হল সানন্দার এ অপরাধের ক্ষমা নেই।

কিছুক্ষণ পরেই টুটুলের গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল, আবার সেই নিরুদ্দেশ অভিযান। এই চিত্ত-চাঞ্চল্যের উপশম হবে কোথায়, কিসে তার চিত্ত বিনোদিত হবে কে জানে? এই ত' প্রকৃতির অভিশাপ, অন্তরে দাহ, সেই তুষানলের উত্তাপে সারা দেহ-মন জর্জরিত হয়ে উঠছে—চিত্তবৃত্তিকে বিভিন্নপথে চালিত করার চেষ্টাও ত' নেই, বিদগ্ধ-জনোচিত মানসিক সংস্কৃতি সাধনায় হয়ত এ বেদনার

উপশম হ'তে পারত। অফুরন্ত সময় নিয়ে বৃথা এই ঘুরে মরা। টুটুলের অন্তর্দাহ জয়তী মর্মমূলে অনুভব করছে। কি নিদারুণ এই শূন্যতা, আর অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস। মুহূর্তগুলিকে আনন্দোজ্জল করে তুলতে পারে শুধু জয়তী, কিন্তু তার পথ রুদ্ধ।

সেই রাত্রিতে ডিনারের টেবিলে জয়তী যোগ দিতে পারলনা, পারলনা সাহেবীয়ানার পোষাকী সামাজিকতার ঠুন্‌কো অনুষ্ঠানে, হাস্যপরিহাসের লঘু আসরে যোগ দিয়ে, নিজেকে মিলিয়ে দিতে। জয়তীর নিজের ঘরটিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল, সানন্দার কাছে পূর্বাহ্নেই নিস্কৃতি চাওয়া হয়েছিল, সানন্দা তাকে অনুরোধের আধিক্যে বিব্রত করেনি।

নারীসুলভ একটা অকারণ কৌতূহল বশতঃই জয়তীর নিজের ঘর থেকেই সানন্দার এই সম্মানিত অতিথিটিকে একবার দেখ্‌ল। কমরেড চৌধুরীকে অসাধারণ কিছু বলে মনে হলনা, টুটুলের অনুপাতে অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তি। পরণে ঢিলা পায়জামা, গায়ে জওহরলালী ফতুয়া আর চোখে শেলের চশমা। কমরেডের পরিচ্ছদের আর পারিপাট্য কি! তবে অধিকন্তুর মধ্যে আছে এক জোড়া গোঁফ, যা এই ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে সচরাচর পুরুষের নাকের নিচে দেখা যায়না। তবু মনে হয় সানন্দার ওপর তার প্রভাব অসামান্য।

এই লঘু হাস্য পরিহাস ও সানন্দার চটুলতা জয়তীর চোখে ভালো লাগলো না। জয়তী বুঝ্‌ল এই চপলতাই টুটুলকে ঘরছাড়া করেছে।

সে রাতেও জয়তীর চোখে ঘুম এল না।

জয়তী কি করবে স্থির করতে পারে না, ভেবে পায়না কি তার পণ। টুটুলের উদার বাহুবন্ধনে এখনই ধরা দেওয়া যায়, টুটুল আকুল হয়ে আছে জয়তীর সান্নিধ্য পাবার জন্য। এদিকে দেশের রাজনৈতিক হাওয়া ক্রমশঃই পরিবর্তিত হচ্ছে, গান্ধীজীর নিত্য নব পরিকল্পনার কথা কানে আসছে, জাপান ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে, ক্রীপস্ মিশন বসেছে. বাতাসে আসন্ন আন্দোলনের প্রকৃতির আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। জয়তী কি করবে, এই সময় জয়তীর যিনি পথ নির্দেশ করতে পারতেন তিনি বাইরে নেই। দিল্লীতে যাদের সঙ্গে দেখা করার কথা, দাদা যাদের নামে পরিচয়পত্র দিয়েছেন, আজো জয়তী তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেনি! এই "মনজিলে"র ঠিকানাটাই যেন তার পরিচয়ের পথে একটা বিরাট অন্তরায় হয়ে আছে। এ কি ভয়ংকর পরীক্ষায় সে জড়িয়ে পড়ল, একদিকে টুটুলের কল্পনাকুশল মায়াময় গভীর চোখের অভ্রভেদী চাহনী অন্যদিকে বিবেকের প্রচ্ছন্ন ভ্রূকুটি, কি করবে সে।

মেজদার নির্দেশ ছিল দিল্লীর কাজ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি শেষ করে কল্‌কাতায় চলে যেতে, কিন্তু ঠিক এই সময়ে কল্‌কাতা থেকে যে সব নিরুৎসাহজনক সংবাদ আসছে তাতে কল্‌কাতা যাবার পথ রুদ্ধ। সেখানকার লোক দলে দলে পালাচ্ছে, যে যেখানে পারছে চলে যাচ্ছে. অন্ততঃ কলকাতা থেকে কোন্নগরে পালিয়েও প্রাণ বাঁচলো বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। কল্‌কাতা নাকি ইতিমধ্যেই জনহীন হয়ে এসেছে। ট্রেনের ছাতে বসেও লোকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে, কিংবা বোমার ভয়ে প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে ভীড়ের চাপে প্রাণ হারাচ্ছে। এমনই সব খবর লোকের মুখে, চিঠিতে, সংবাদ-পত্রের ইঙ্গিতে ভেসে আসছে। খুব গোপনীয় সংবাদ, লাট দপ্তর

নাকি ইতিমধ্যেই সরিয়ে বহরমপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুতরাং কলকাতা যাত্রা দুরাশা।

ক্রীপস্ মিশনের সাফল্যজনক পরিণতি হলে, মেজদার কারাবাসের দিন হয়ত কমে যাবে, দেশের লোকের হাতে নাকি গভর্ণমেণ্ট আসছে, চারিদিকে একটা থম্‌থমে ভাব। জয়তী উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে সুযোগ পেলেই স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এই যুদ্ধ জন যুদ্ধ মনে করে 'ওয়াকীর' সংখ্যা বৃদ্ধি করার বাসনা তার নেই।

জয়তী আবার পাশ ফিরল।

আরো কয়েকদিন কাটল। "মন্‌জিলে" জয়তীর খ্যাতি ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে, সানন্দা এইটুকুই চেয়েছিল, জয়তীর মন বসেছে দেখে' সানন্দা খুসী হয়েছে। চাকর ও দাসী মহলে গোলোযোগ নেই, সংসারে একটা শান্তি ও শৃঙ্খলা এসেছে, 'মন্‌জিলের যেন শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। কিছুদিন আগে এই অবস্থা কিন্তু কল্পনাতীত ছিল।

এর প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই ঘটল, সানন্দার মত অলস প্রাণীর কাছে জয়তী হল অন্ধের যষ্টি, জয়তী ছাড়া সানন্দার আর চলেনা। এখন সানন্দার মাঝে মাঝে মনে হয় এতদিন বিনা জয়তীতে চলেছে কি করে। ব্যক্তিগত প্রীতিতে জয়তীকে সানন্দা বিব্রত করে তোলে, জয়তীকে তার সত্যই ভালো লাগে। জয়তীকে সে সত্যই মানুষ করে তুলতে চায়। খদ্দরের রুক্ষ আবরণ সরিয়ে পরাতে চায় সুক্ষ্ম ক্রেপ্-ডি-সিন, ঘরে ও বাইরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পার্টিতে তাকে আনতে চায়, চায় হীরু সেন, গণপতি মল্লিক, কমরেড চৌধুরী, প্রভৃতি পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় করাতে, জয়তী সভয়ে পাশ কাটিয়ে চলে, যখন কিছুতেই এড়াতে পারে না তখন বাধ্য

হয়ে নীরবে এসে বসে, সেই ফ্যাসান সর্বস্ব সমাজে—জয়তী যেন সম্পূর্ণ অচল, বে-মানান, তবু তাকে থাকতে হয়।

টুটুলের সঙ্গে ইদানীং অল্পই দেখা হয়, টুটুল প্রায়ই দিল্লী ছেড়ে চলে যায়। আজকাল মিলিটারী কতকগুলি কনট্রাক্ট পাওয়া গেছে, টুটুল সমস্ত মনপ্রাণ নিয়োগ করে সেই আয়োজনেই নিজেকে ঢেলে দিয়েছে। 'মন্‌জিলে' যখন উপস্থিত থাকে তখন সানন্দার টানা-টানিতে পার্টিতে যোগ দেয়! স্বামী হিসাবে যে টুটুলের এই গৌরব বৃদ্ধি তা নয়, সানন্দা জানে টুটুলের মেয়ে মহলে প্রতিপত্তি আছে, গৃহকর্তা হিসাবে তাকে মানায় ভালো, টুটুলই তখন প্রধান আকর্ষণ, সানন্দা নয়।

জয়তী টুটুলকে লক্ষ্য করে তার জন্য মনে মনে বেদনানুভব করে। সকলের সঙ্গে টুটুল আলাপ-আলোচনা, হাস্য-পরিহাসে মশ্‌গুল হয়ে আছে অথচ অন্তরে কতখানি ফাঁক। জয়তী বোঝে সব—এই টুটুলের বিবাহিত জীবন কি অপরিসীম আত্ম-প্রবঞ্চনা।—টুটুল হেসে উঠলে জয়তীর কানে তা আর্তনাদের মতো করুণ হয়ে বাজে।

এই বাড়িতে কম্‌রেড্ চৌধুরীর যেন অবাধ অধিকার। হীরু সেন আজকাল কম আসেন। জয়তীর সঙ্গে ইতিমধ্যে তাঁর কয়েকবার দেখা হয়েছে, জয়তী সেই পরিচয়কে সৌজন্যসূচক মৌখিক আলাপের বেশি অগ্রসর হতে দেয়নি। শুনেছে কমরেড চৌধুরী, কম্‌রেড হলেও সর্বহারা নয়, কমরেডের পিতৃদেবের বাংলা দেশের পূর্বাঞ্চলে জমিদারী আছে, সরকারী অনুগ্রহে "রাজা" খেতাব আছে, সেই খাতিরে কম্‌রেডও কুমার, কিন্তু ইদানীং কুমারের চাইতে কমরেড উপাধির মোহ বেশি তাই কমরেড হয়েছেন। এঁরও

গাড়ি আছে, তার বনেটে লাল সালুর পতাকায় সাদা কাপড় দিয়ে কাস্তে হাতুড়ি আঁকা পতাকাও ওড়ে, তাঁর পিতৃদেবের কলিয়ারিতে মজুরদের ওপর যথারীতি জুলুমও চলে, দিল্লীতে যে কাপড়ের কল বসছে, রাজা বাহাদুর তার অন্যতম কর্তৃপক্ষ, সুতরাং তাঁর তরফ থেকে দেখাশোনা করার জন্য কমরেড দিল্লীতে থাকেন, কর্তা কাউনসিল অফ্ স্টেটের অধিবেশনের সময় মাঝে মাঝে আসেন। দুচার ঘর বড় ঘর-ওয়ানার সঙ্গে আলাপ করেন, অবসর সময়ে মোটর নিয়ে এদিক ওদিক ঘোরেন। লালা হরিরাম আর সর্দার বখ্শিষসিং-এর সঙ্গে খানা পিনা করে দিন যাপন করেন। সুতরাং কমরেড চৌধুরী বর্তমানে দিল্লীতে একজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি, সর্বত্রই তাঁর ডাক পড়্ছে, এর ওপর খদ্দরের পায়জামা ও জওহরলালী জ্যাকেটে যেটুকু ফাঁক ছিল তা ভরে গিয়েছে, এ যেন দেশ প্রেমিকের লেবেল গায়ে আঁটা হয়েছে, গাড়ির বনেটে লাল ঝাণ্ডাটা ইদানীং দেখা যাচ্ছে।

জয়ন্তী কিন্তু কমরেড্ চৌধুরীকে গোড়া থেকেই সুনজরে দেখ্তে পারেনি তার কারণ অবশ্য টুটুল,—টুটুল যে চৌধুরীর জন্যই অনেকাংশে বঞ্চিত হয়ে আছে এই ধারণাই জয়ন্তীর মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে। চৌধুরী লোক মন্দ নয়, বেশ মজ্লিসি লোক, কিছুদিন নাকি সমুদ্রপারেও ছিলেন, তার রেশ এখনও পাইপে ও ইংরাজী উচ্চারণে বর্তমান। মাঝে মাঝে যখন রাজনৈতিক হাল চাল সম্পর্কে অলোচনা শুরু করেন তখন প্রথমটায় মনে হয় অনেক কিছু শোনা যাবে কিন্তু পুঁথিগত কথার পুঁজি শেষ হলেই সে সব কথা শেষ হয়। তখন অকারণে বিভিন্ন মতাবলম্বী নেতাদের সম্পর্কে কটুক্তি করে বসেন। জয়ন্তীর খদ্দর প্রীতির উল্লেখ করে বলেন, এটা ভালো, দেশের

সকলেরই খদ্দর পরা উচিত, গান্ধীজীর এই চেষ্টাটাই ভালো। এই সব মুরুব্বিয়ানা জয়তী চুপ করে শোনে, কোনো মন্তব্য করে না, পাছে তার নিজস্ব মতবাদ ধরা পড়ে যায়! ভাবে, সানন্দা ভালোই করেছে, তবু একটা সাংস্কৃতিক সংযোগ বজায় রেখেছে।

কমরেড্ চৌধুরীর সঙ্গে সানন্দার প্রীতির সম্পর্ক আছে বোঝা যায়। হয়ত এদের সমাজে এটা স্বাভাবিক, হয়ত সানন্দা তার নিজস্ব নীতি অনুসরে টুটুলের কাছে কোনো অবিশ্বাসের কারণ হয়ে ওঠেনি। জয়তী এই নব্য-নীতির মর্ম বুঝ্তে পারে না, তবে যতই দিন যায় ততই একটি কথা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—এই "মন্‌জিল" তাকে শীগ্গীর ছাড়্তে হবে।

টুটুলের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়, হয়ত খুব উদ্বিগ্ন, কিংবা অন্যমনস্ক। একদিন মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল, টুটুল আবেগভরে জয়তীর হাতদুটি ধরে বল্লে—ভালো লাগ্ছে না, না জয়া? এখানকার হাওয়া তোমার সইছে না।

জয়তী দৃঢ়কণ্ঠে বল্লে—একটুও নয়।

—মনে হয়, তুমি বেশি দিন থাকৃতে চাওনা, আমাকেই এরা পাগল করে তুলেছে। মাঝে মাঝে ভাবি ওপরতলার ঐ ঘরটিতে নিরালায় বসে কি কর্‌ছ তুমি, কি ভাবে দিন কাট্‌ছে! এমনই জনতা থেকে দূরে, আমিও যদি দিন কাটাতে পারতাম, তোমার সান্নিধ্য পেতুম, হয়ত একটু শান্তি, কিছু সান্ত্বনা, আমার মিলত।'

জয়তীর অন্তর আকুল হয়ে উঠ্ল, কি জবাব দেবে সে, টুটুলের হাতের ভিতর তার হাতটি চঞ্চল হয়ে উঠল—গভীর অন্তরঙ্গতায় সে টুটুলের আঙুল দুটি টিপল—তারপর সেখান থেকে সবেগে ছুটে পালালো।

আরও এক সপ্তাহ কাট্‌লো, 'মন্‌জিলে' অনেক কাজ, গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি, এত কাজ যে, জয়ন্তীর এই মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতরও মাঝে মাঝে মনে হয় সময় যেন দ্রুত ধাবমান। তবু কিছু করার উপায় নেই। দিল্লীর কর্মীদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই সংযোগ ঘটেছে, তাঁরা নির্দেশ দিয়েছেন উপস্থিত চুপ করে থাকতে, ক্রীপস্‌ মিশনের আলোচনা শেষ হলেই কাজের নির্দেশ পাওয়া যাবে।

যত দীর্ঘ দিন এখানে থাকৃতে হবে, ততই বিশ্রী লাগবে, ততই জটিলতা বাড়্‌বে, কারণ সানন্দা বা টুটুল কেউই তাকে ছাড়তে চায়না, সানন্দার শয়নকক্ষে সেদিন সন্ধ্যায় জয়ন্তী বসে রেডিও শুন্‌ছিল। সানন্দার শরীরটা ভালো নেই। এমন সময় কমরেড চৌধুরী ঘরে এলেন, জয়ন্তীকে দেখেই পরম উৎসাহভরে বল্লেন—ওদিকে ক্রীপস্‌ মিশন ব্যর্থ হোল, নেতারা সবাই গররাজী, কিন্তু তার চেয়ে বড় খবর কি জানেন ?

জয়ন্তী রেডিওটা বন্ধ করে উদ্‌গ্রীব হয়ে বল্‌লে—কি সংবাদ ! কমরেড বল্‌লেন—শুনে এলুম ভিসি রেডিও খবর দিয়েছে, ডোমেই এজেন্সীর খবর, সুভাষ বোস্‌ এয়ার ক্রাসে মারা গিয়েছেন। গুড্‌ নিউজ্‌! কি বল সানন্দা ?

—জয়ন্তীর মুখখানি নিবিড় বেদনায় ম্লান হয়ে গেল, সে বল্লে, খবরটা বড় বটে কিন্তু গুড্‌ নিউজ্‌ কি হিসাবে মিঃ চৌধুরী ?

—মানে এতবড় একটা ফ্যাসিস্ট কুইস্‌লিং। আমাদের দেশের পরম শত্রু জানেন ?

—সুভাষ বসু ফ্যাসিস্ট আপনি জানেন ? তিনি ত' আর তাঁর

দেশের বিরুদ্ধে শত্রুতা করেন নি, তাহলে দ্য গলও হয়ত কুইস্‌লিং!

—ফ্যাসিস্ট না হলে এ্যাক্সিসে যোগ দেয়। এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ।

জনযুদ্ধ কি হিসাবে? রাশিয়ায় জনযুদ্ধ হতে পারে, আমরা ত' কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিনি। আমাদের আবার শত্রু কে?

কমরেড অত্যন্ত আহত হয়ে বল্‌লেন—আপনার পলিটিক্যাল ওপিনিয়ন যে এতখানি ব্যাক্‌ওয়ার্ড তা জান্‌তাম না। জনযুদ্ধ না হলে জাপানকে রুখবে কে?

জয়তী একটু সাম্‌লে বল্‌লে—ইংরেজের সাম্রাজ্য জাপান কেড়ে নিচ্ছে। জাপানের সাম্রাজ্য ইংরেজ কাল কেড়ে নেবে। তাতে আমাদের কি, আমরা ত' দর্শক, আমরা না ইংরেজ না জাপানী। আমরা কাউকেই যখন সমর্থন করিনা তখন জনযুদ্ধের মানে?

—সে তত্ত্ব আর একদিন আপনাকে বোঝাব, কতকগুলো পার্টি লিটারেচার আপনাকে দিয়ে যাব, কিন্তু আপনার এই কুইস্‌লিং প্রীতিতে আমি দুঃখিত।

—আপনি ভুল করছেন মিঃ চৌধুরী, আমি কারো মতের সমর্থক নই, প্রীতি কারো ওপর নেই, তবে যাঁর ত্যাগ আছে, যাঁর জীবন মন-প্রাণ দেশের কাজেই উৎসর্গীকৃত, তার মৃত্যুতে উল্লাস কর্‌বো এতখানি বর্বর নই।

কমরেড চৌধুরীর কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বল্‌লেন—পরে আপনাকে এর জন্য অনুতাপ করতে হবে হয়ত, আপনার ভুল ভাঙতে পারলে খুসী হতুম।

জয়তী বল্লে—আমার ভুল নিয়েই আমি থাকতে চাই মিঃ চৌধুরী।

পররাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে দেশ স্বাধীন করার জন্য যাকে আজ দেশ-দ্রোহী বলছেন, ইতিহাস আলোচনা করলে দেখ্‌বেন অনেক মহা-পুরুষ অতীতে এই কার্যই করেছেন।

—ইতিহাসের আপনি কি জানেন?

আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য একদিন ফ্রান্সের সাহায্য নিয়েছেন। তিনি কি দেশদ্রোহী? স্বদেশের সাহায্যে স্ট্যালিনকেও আমেরিকার মত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাহায্য নিতে হয়েছে, স্ট্যালিনও দেশদ্রোহী?

কমরেড চৌধুরী ক্রোধে অন্ধ হয়ে সানন্দাকে উদ্দেশ করে বল্‌লেন—তুমি বাড়িতে এমন কালসাপ পুষে রেখেছ সানন্দা কি ভয়ানক!

সানন্দা জয়তীকে মৃদু তিরস্কার করে বল্‌লে—জয়া তোমার এসব স্বদেশীর কথায় না থাকাই ভালো, জানো মিঃ পাকৃড়াশী (টুটুল) শীগ্‌গীরই ও, বি, ই, হবেন। দুবার রেকমেণ্ডেশন গেছে—

জয়তী বুঝ্‌লো, তার এই অকারণ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা ভালো হয়নি। এতদিন ধরে এই কমরেডটির কাছে আত্ম-গোপন করে এসে সে আজ ধরা পড়ল। অনুশোচনায় জয়তীর অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। জয়তী ধরা গলায় বল্‌লে—আমাকে মাফ করবেন মিঃ চৌধুরী—আপনাকে আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে আমি কিছু বলিনি!

কমরেড কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে বল্লেন—দোষ আপনার নয়, দোষ যত ন্যাশানালিস্ট কাগজওলার। সব বেটা আসলে এক একটি ফ্যাসিস্ট, ওরাই ত' আপনাদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। আমাদের পার্টির বই-গুলো আপনাকে একে একে দেব, পড়ে দেখবেন—'

সানন্দা এইবার বল্‌ল—আমি ত' অত শত বুঝিনা, তবে খবরের

কাগজের সুর দেখে বুঝ্‌ছি গান্ধীর দল লীগ্‌গীরই একটা মুভ্‌মেণ্ট চালাবে, তাহলে আপনারা কি করবেন কমরেড চৌধুরী?

—এ্যাট্ দিস্ স্টেজ্ মুভ্‌মেণ্ট! সর্বনেশে কাণ্ড হবে, আমাদের পার্টির ওপর থেকে ব্যান্ উঠ্‌বে—আমরা বাধা দেব, এই সব আন্দোলনে সাহায্য করা মানে ফ্যাসিস্টদের সাহায্য করা হবে, কংগ্রেস ক্রমশঃই ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠ্‌ছে। যত টাটা আর বিড়লার টাকায় কংগ্রেস।

জবাব দেবার জন্য জয়তী উস্‌খুস করে ওঠে, ফ্রেডরিক পাক্‌লের কুখ্যাত গোপন সার্কুলারের কথা উল্লেখ করার বাসনা হয়—কিন্তু সংযত হয়ে চুপ করে বসে রইল, আর সে ধরা দেবেনা। সানন্দার রাজনৈতিক জ্ঞান সামান্য। নির্বোধের মত কিছু না বুঝেই বল্‌লে—ওঃ তাই নাকি?

কমরেড গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন—একদিন সব ভালো করে বুঝিয়ে দেব, ভেরী ইন্‌টারেস্টিং—

নিভানো পাইপটা জ্বালিয়ে স্ট্যালিনীয় ঢঙ্‌এর শুক্‌নো চুলে আঙুল চালিয়ে বল্‌লেন—কংগ্রেস এবার ভেঙে যাবে, এইবার মুভ্‌মেণ্ট করা মানে নিজের ডেথ্ ওয়ারেণ্ট সই করা, ব্যান্ তুল্‌লেই এদিকে আমাদের পার্টি মেম্বারসিপ্ হু হু করে বেড়ে যাবে।

জয়তী চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল, অথচ এমন মুস্‌কিল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় না, দরজা আগলে বসে আছেন কমরেড।

অবশেষে কমরেডই উঠ্‌লেন, বল্‌লেন, আজ আবার একটা সিক্রেট মিটিং আছে, রাত দশটার পর, চল্‌লুম। তারপর জয়তীর দিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বল্‌লেন—আপনার জন্যে খানকতক বই পাঠিয়ে দেব, পড়ে দেখবেন,—

জয়তী চুপ করে রইল।

কমরেড চৌধুরী চলে যাবার পর ঘরটি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল, কিছুক্ষণ পরে জয়তীই প্রথম কথা সুরু করল, বল্‌লে—

—আচ্ছা জামাইবাবুর শরীরটা একটু খারাপ দেখাচ্ছে না ইদানীং ?

সানন্দা হাই তুলে তাচ্ছিল্য ভরে বস্‌ল—তাই নাকি! তা হবে—কে আর ওসব লক্ষ্য করেছে।

জয়তী বল্‌লে—আমার যেন মনে হ'ল একটু কেমন তরো, আচ্ছা মাঝে মাঝে তোমরা একটু কোথায় ঘুরে আস্‌তেও ত' পার,—তাতে হয়ত শরীর ও মন ভালো হতে পারে।

সানন্দা অদ্ভুত ভ্রুভঙ্গী করলো—বল্‌লে—জয়তী তাতে দুজনেরই মেজাজ আরো খারাপ হয়ে উঠ্‌বে, কেঁদে ফিরতে হবে।

—তোমার ভুল হতেও ত পারে দিদি ?

সানন্দা অট্টহাস্য করে উঠ্‌ল—জয়া, তুই সেই ছেলেমানুষই আছিস্ সেই রোমাণ্টিক্ ঝোঁক, বাস্তব জগতে রোমান্স টোমান্স কিছু নেই, সব ফাঁকা, ওসব কল্পনার ফানুষ—

জয়তীর ইচ্ছা হ'ল চীৎকার করে বলে—তোমার ভুল, রোমান্সের কখনও অবসান হয়না, আরো কিছুদিন কাট্‌লে বুঝ্‌বে—কি হারালে আর কি পেলে—

কিন্তু জয়তী চুপ করে রইল। সানন্দার মাথা ধরেছিল, জয়তী তার মাথায় হাত বুলাতে লাগ্‌ল, জয়তী ভাবতে লাগ্‌ল টুটুলের তরফ থেকে তার এই ওকালতী নিস্ফল হল, সত্যিই হয়ত সানন্দার সান্নিধ্যে টুটুলের কোন লাভ ক্ষতি নেই, এই অন্তরঙ্গতা টুটুলের কাম্য নয়, হয়ত টুটুল আর কখনও সানন্দাকে ভালবাসতে পারবে না, কিন্তু

তাতে জয়তীর কি? জয়তীর কি অপরাধ? সানন্দার কাছ থেকে সে কিছুই কেড়ে নেয়নি, জয়তী এ বাড়ীতে আসার বহু আগেই টুটুলকে সানন্দা দূরে সরিয়ে দিয়েছে, জয়তী যখন এখানে এসেছে তার পূর্বেই সানন্দা আর টুটুলের মধ্যবর্তী ব্যবধান বিস্তীর্ণ হয়ে উঠেছে।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি একটা মস্ত ভোজের আয়োজন শুরু হ'ল, কোনো উপলক্ষ্য যে নেই তা নয়, জুন মাসের বার্থ ডে লিস্ট-এ টুটুলের কপালে ও, বি, ই নয় একটা এম, বি, ই জুটেছে। উপস্থিত সেইটিই উপলক্ষ্য, অন্য বছর কোনো উপলক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না, এমনই একটা বিরাট ভোজ অক্টোবরে হয়ে থাকে। এই আয়োজনকে সাফল্য-মণ্ডিত করার জন্য অজস্র অর্থব্যয় হবে, আর সব কিছু বন্দোবস্তের ভার পড়েছে জয়তীর ওপর।

এই পার্টির কোলাহলের বাইরে জয়তী থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু তা হ'ল না, সানন্দা ও রঞ্জিং উভয়েই জয়তীকে কিছুতেই ছাড়তে চাইল না, উৎসবের দিন প্রাতে রঞ্জিং জয়তীকে একা পেয়ে বল্লে—

—আজ আর পালিও না যেন, অনেকে আসবেন, দু'চারজন সত্যিকার ভালো লোকও আছেন তার ভিতর। তুমি আড়ালে থাকলে আমার নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হ'বে।

জয়তী নিরুত্তর থেকে সম্মতি জানিয়েছিল।

পার্টির আয়োজন হয়েছিল অপূর্ব, কদিন ধরেই আকাশ তেমন মেঘমুক্ত ছিল না, আজ আর আকাশে মেঘভার নেই, সময়োপযোগী উষ্ণতা তেমন অনুভূত হচ্ছে না, সুতরাং পার্টি জমবে ভালোই। "মনজিলে"র সমস্ত জানালাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে, সেই আলো

এসে পড়ছে নীচের বাগানে, বাগানের কয়েকটি গাছে বিভিন্ন বর্ণের বৈদ্যুতিক আলো ঝিকমিক করছে, সমস্ত জড়িয়ে বাড়িটিকে স্বপ্নপুরী মনে হচ্ছে, সুইমিং পুলটিকে ফ্লাড্ লাইট দিয়ে আলোকিত করা হয়েছে, অতিথিরা ইচ্ছা করলেই একবার ডুব দিতে পারেন। আর ভোজ্য ও পানীয় বস্তু সম্পর্কে কোনো কার্পণ্য নেই। এই সব ব্যবস্থা দেখে কে মনে করবে যে পৃথিবীতে এক বিরাট যুদ্ধ চলেছে, বাংলা দেশের লোকেরা অন্নাভাবে দিনের পর দিন ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

অতিথিদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন জয়ন্তীর পরিচিত। তাঁরা মাঝে মাঝে "মনজিলে" এসে থাকেন, এর মধ্যে হীরু সেন আর কমরেড চৌধুরীও আছেন, হারু সেন গম্ভীর, নিতান্ত অপরিচিতের মতো ঘোরা ফেরা করছেন, কিন্তু কমরেড চৌধুরী খুবই ব্যস্ত। তিনি গৃহকর্ত্রী সানন্দার সান্নিধ্য ছাড়ছেন না মোটেই, আজ তাঁর দৈনন্দিন কমরেডি পোষাকের ওপর মাথায় একটা গেরুয়া রঙ-এর গান্ধি টুপী চড়েছে, মোটের ওপর মন্দ মানায়নি। আর সানন্দা আজ সন্ধ্যায় পরম রমনীয় হয়ে উঠেছে, কি অপূর্ব তার প্রসাধন ও পারিচ্ছদ পরিপাট্য। জয়ন্তী মুগ্ধ হয়ে সানন্দার দিকে কিছুকাল তাকিয়ে রইল। সানন্দার ওপর তার বিরক্তি থাকতে পারে, টুটুল ও সানন্দার বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য অন্তরে ঈর্ষা থাকতে পারে। কিন্তু সানন্দার রূপ মাধুরীর তুলনা হয় না। পুরুষের হৃদয়ে দাহ ও জ্বালা সৃষ্টি করতে সানন্দার উপস্থিতি যথেষ্ট। সানন্দাকে দেখে মনে হয় সে যেন কোনো অন্যায়, কোনো গর্হিত কার্যে বিজড়িত হতে পারে না। জয়ন্তীর মনে ভাব-প্রবণতার আধিক্য আছে, সানন্দাকে দেখে জয়ন্তীর মনে হল, সে যেন স্বর্গের দেবী। কেমন একটা অতীন্দ্রিয় জ্যোতি তার শরীরে। কিন্তু রঞ্জিং

পাকড়াশীর এদিকে দৃষ্টি নেই। সানন্দার দৈহিক আবেদনে তার মনে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। রঞ্জিৎ তাই সানন্দাকে পাশ কাটিয়ে চলেছে, অতিথিদের আপ্যায়ন করছে, যথারীতি যুদ্ধ, ব্যবসা, এবং দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করছে, আর মাঝে মাঝে জয়তীর কাছে গিয়ে কথা বলছে।

জয়তীর প্রসাধনে পারিপাট্য নেই, পরিচ্ছদে প্রজাপতির বর্ণ-সমারোহ নেই, সেই খদ্দরের শাড়ি, তাই সে চমৎকার করে পরেছে, ব্লাউজের পিস্তল হাতার পর যে পরিপুষ্ট অনাবৃত অংশটুকু দেখা যাচ্ছে, পুরুষের মনে মোহ সঞ্চার করবার জন্য তাই যথেষ্ট। রঞ্জিতের কাছে জনতা তাই মুছে গিয়েছে, তার মনে হচ্ছে এই উৎসব মুখরিত প্রাঙ্গনে যেন শুধু সে আর জয়তী দুজনে একা রয়েছে, পিঁয়াজ রং-এর একটা সামান্য খদ্দরের শাড়িতে জয়তীকে কি সুন্দরই না মানিয়েছে।

রঞ্জিৎ একটু নিরালায় পেয়ে জয়তীর এলো খোঁপার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল—তোমাকে কি মানিয়েছে জয়া। অদ্ভুত!

জয়তী কি বলবে, টুটুলকে নতুন কথা কি আর সে শোনাবে। টুটুল আবেগভরে জয়তীকে বাহুর বাঁধনে টানবার জন্য এগিয়ে এল। জয়তী বাধা দিয়ে বলল—না টুটুল, ছিঃ, আমি পালাই।

টুটুল আবেগভরে বল্লে—কেন? কেন তুমি পালাবে? কিসের এই অভিনয়! কিসের লুকোচুরি? তুমি আর আমি একসুরে বাঁধা জয়া, তুমি আমার—

জয়তী অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে—না টুটুল—কিছুই বলার নেই, তোমার প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলে? আমাদের যে কিছুই করার নেই।

অতি কষ্টে টুটুল হৃদয়াবেগ সংযত করল, জয়তী লক্ষ্য করল টুটুলের মুখভাব, আবার সে মুখে কাঠিন্য ফিরে এসেছে, মনে মনে

এই সংকটময় মুহূর্তের নির্বিঘ্ন অবসানের জন্য বিধাতার কাছে প্রার্থনা জানালো জয়ন্তী।

টুটুল বল্‌ল—জয়া, তোমার কথাই ঠিক! তোমাকে কি আর বল্‌তে পারি, এই ভাবাতিশয্যের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। চলো বাইরে বাগানের দিকে একটু বেড়িয়ে আসি।”

বেদনাভরা নীরবতায় উভয়ে সেই আনন্দ কোলাহল মুখরিত হলঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়্‌ল, লনের পশ্চিমে চামেলী গাছের ঝোপ, তার নীচেই একটা লোহার বেঞ্চ পাতা আছে, চামেলী ঝোপের পাশ দিয়ে যাবার সময়, সহসা যেন কার গলা পাওয়া গেল, সচকিত হয়ে সেইদিকে লক্ষ্য করতেই দেখা গেল, সেই প্রায়ান্ধকার নির্জন অঞ্চলে দুটি প্রাণী নিবিড় আলিঙ্গনে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

জয়ন্তী তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল, সহসা যেন কি একটা ভয়ংকর বস্তুর সাম্‌নে এসে পড়েছে, মৃদু কণ্ঠে রঞ্জিংকে বল্‌ল: টুটুল এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার—’

রঞ্জিৎ কোনও উত্তর দিলনা, জয়ন্তী সেই আলো ছায়ার ভিতরে টুটুলের মুখভঙ্গী লক্ষ্য কর্‌ল, বিশ্ব-জগৎ সম্পর্কে অচেতন প্রেমিক যুগলের দিকে পুনরায় লক্ষ্য করতেই, লজ্জা ও ঘৃণায় জয়ন্তীর মুখখানি আরক্ত-হয়ে উঠ্‌ল। চুম্বনরত ব্যক্তিটির মাথার গৈরিক গান্ধী টুপীতে তাঁর পরিচয় স্বপ্রকাশ, আর সেই কমরেডের বাহুতললগ্না লীলাময়ী সানন্দাকে চিন্‌তে বেশি গবেষণার প্রয়োজন হয় না।

‘হলে’ ফিরে এসে জয়ন্তী কি যে বল্‌বে, আর কোনদিকে তাকাবে ঠিক করতে পারে না—রঞ্জিৎই তার এই অপ্রতিভ ভঙ্গী কাটিয়ে প্রথম কথা বল্‌ল—কি বিশ্রী কাণ্ড জয়া? বিনা প্রদর্শনীতেই অবশ্য জান্‌তাম

কি ব্যাপার চলেছে, কিন্তু এ কি? 'মন্‌জিলে'র ভিতরেই এই ব্যাপার!"

জয়ন্তী—আচ্ছন্ন কণ্ঠে বল্লে—আমি কিছুই করতে পারলাম না টুটুল, দিদিকে স্পষ্ট করে কিছু বলার সাহস আমার নেই।

—তুমি কি করবে? তুমি ত' আমাকে বলেছিলে সব ভুলে গিয়ে সানন্দার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে, সানন্দার কাছে গিয়ে বলি দেহি পদপল্লবমুদারম্—'

—না-না, তা কেন? আমি কি তাই বলেছি, দিদিকে একটু বোঝাতে বলেছিলুম।

সে চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমি হার মেনেছি, আজ যদি চৌধুরীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিই, তাহ'লে হীরু সেন আছে, তার সঙ্গে ইদানীং মেলামেশা কমে এসেছে, আর নয়ত বাড়িতে যে কেলেঙ্কারী চলেছে তা বাইরে পর্যন্ত গড়াবে। জানি, সানন্দাকে ধরে রাখা চলবেনা, ওর বাঁধন কেটেছে, তবে মোহ কাটেনি। যেদিন ঐশ্বর্যের মোহ ওর কাটবে, সেদিন অচল ফ্যাসানের শাড়ি ব্লাউজের মত এ বাড়িও সে অবলীলাক্রমে ছেড়ে যাবে, এখন আমার সওয়ার পালা—'

জয়ন্তী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্ল—আমার অনেক কথা আছে, দিল্লীতে আমার আরো কাজ ছিল, সে কথা তুমি পরে জানতে পারবে, কিন্তু আর ত' আমি "মন্‌জিলে" থাকতে পারি না। কাল আমি চলে যাব—"

—যদি একান্তই যেতে চাও, আমি বাধা দেবনা, কথা আছে, নৌকো ডোবার আগে ইঁদুরেরা পালায়, তুমি অবশ্য ইঁদুর নও, তবে আমার এ ডুবন্ত নৌকা ত্যাগ করাই ভালো—'

অত্যন্ত উদ্বেগাকুল' ও বিষণ্ণ দৃষ্টিতে উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে

চেয়ে রইল, তারপর রঞ্জিৎ সহসা আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল তুমিই আমাকে বাঁচাতে পারো, আমাকে তুমি নাও—'

জয়ন্তী দু হাতে মুখ ঢাক্‌লো।

এদিকে কমরেড চৌধুরীর বাহু বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে সানন্দা লঘু হেসে বল্‌ল—নাঃ এ ভাবে আর চলেনা—।' সানন্দার এই হাসি তার গভীর ভাবানুভূতির পরিচায়ক।

পরিতৃপ্ত কমরেড একটি সিগ্রেট ধরালেন তারপর দেশলাই-এর কাঠিটি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে বল্লেন ঃ ঠিকই বলেছ নন্দা, এ আর চলেনা, এই লুকোচুরী, আর চলনা—'

—ক্রমশঃই আমরা একটা যেন ক্রাইসিসের দিকে এগিয়ে চলেছি।

—চলেছি কি পৌছে গেছি বল, আমরা যেন ক্রাইসিসের মাউণ্ট এভারেষ্টে বসে আছি—' কম্‌রেড একটু লঘু ভাবেই বল্‌লেন।

—আর আজ এই পদস্খলন !

এই কথায় কমরেড একটু বিস্মিত হলেন, রহস্যটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম হ'ল না। কমরেড সত্যই সানন্দার প্রেমে ডুবে আছেন, জানেন সানন্দা অপরের স্ত্রী, কাজটা গর্হিত তবু তাঁর মোহ কাটেনা। সানন্দার নিজের মুখেই শোনা গেছে তাদের স্বামী স্ত্রীতে মোটেই প্রীতি নেই, উভয়ের মধ্যে বোঝা পড়ার অভাব। কমরেড জানেন মিঃ পাকড়াশী লোক ভালো, তবে লোকটা বড় সিরিয়স প্রকৃতির, সে চায় সানন্দাও তেমনই সিরিয়স হোক্। তা কি হয়। সানন্দা বেগাস্ব অশ্বের মত উদ্দাম, আলস্য, আর বিরামবিহীন আনন্দ স্রোতে প্রবহমান থাকাই তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ। গৃহমুখী মন তার নয়, অথচ পাকৃড়াশীর মন হ'ল সংসারী, সে চায় নীড় রচনা

তবু এরা স্বামী স্ত্রী অসুখী। কমরেডের বিশ্বাস যে সানন্দাকে সেই শুধু সুখী করতে পারে।

রণজিতের চাইতে কমরেডের বয়স বেশি, সানন্দার চাইতে অনেক বেশি, সানন্দাকে খুসী রেখে, তার সঙ্গে মস্‌করা করে সময় কাটাতে তার ভালো লাগে। সানন্দার সব কিছু কাজেই কমরেড চৌধুরীর সমর্থন আছে। সানন্দার জন্য সে অনেক কিছুই করতে পারে। অসহায়ের মত অসহায়ভাবে সানন্দার প্রেমে কমরেড জড়িয়ে পড়েছে।

পাইপ, টেনিস আর সুন্দরী রমণী, কমরেডের জীবনের সর্বপ্রধান আকর্ষণ, আর এখন সুন্দরী, উচ্ছৃঙ্খল সানন্দা তার জীবনের সব কিছু হয়ে উঠেছে। তবে রাজা বাহাদুর এখনও বর্তমান থাকায় তাঁর হাতে আশাতীত অর্থ এখনও এসে পড়েনি, এইটাই যা দুঃখ। সব ছাড়া যায়, কিন্তু সানন্দাকে ছাড়া অসম্ভব।

কমরেড চৌধুরী সভয়ে প্রশ্ন করল, পদস্খলনের ইঙ্গিতটা ঠিক বুঝ্‌লাম না নন্দা! আমার এই আসা যাওয়ায় মিঃ পাকড়াশী কোনো রকম—

—মিঃ পাকড়াশী খুবই—, কিন্তু সে কথা কথা নয়, আমিই যে, হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি।

কমরেড নার্ভাস চিত্তে গোঁফে হাত বুলাতে লাগলেন, ঠিক যে কি ঘটেছে তা বোধগম্য হচ্ছেনা, আবার প্রশ্ন করলেন—আমাকে নিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌লে নাকি?

সানন্দা তার শুভ্র হাত দুটি দিয়ে কমরেডের হাত ধরে বল্লে—না না, তোমার জন্য নয়, চৌধুরী, তোমার তুলনা নেই, আমি আমার নিজের অবস্থা নিয়েই হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি চৌধুরী। মিঃ পাকড়াশী যদি আজ অন্য কারো প্রেমে পড়ে তাতেও আমি দুঃখিত হব না। হয়ত

আমি খুসী হব, পাকড়াশী ক্রমশঃই আমার ওপর চট্‌ছে, বুঝতে পারি। তুমি হয়ত মনে করবে আমি কঠিন কঠোর। কিন্তু তা নয়—'

কমরেডের কানে কথাগুলো কেমন বেসুরো বাজলো। তিনি বল্লেন—কিন্তু দোষ ত' তোমার নয় নন্দা। ওঁর মত স্বার্থপর লোককে ভালোবাসা কি সম্ভব ?'

—কিন্তু এইখানে এইভাবে তাকে আঁকড়ে পড়ে থাকাও আমার অন্যায়—আমি এই বাঁধন ছিড়তে চাই, নিজের ওপরই আমার আর শ্রদ্ধা নেই।

কমরেডের বিস্ময়ের ঘোর আর কাটে না, একি মূর্তি আজ সানন্দার! কি সে চায়—কি তার বক্তব্য! সহসা পাকড়াশীর ওপর এই করুণা কেন? সানন্দার হাতদুটি নিজের ঠোঁটের প্রান্তে তুলে কমরেড আবেগভরে বল্লেন—আমি ত' তোমাকে বহুবার বলেছি, চলে এস আমার সঙ্গে, আমার পার্টির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়। তোমার মত মেয়ে আমাদের পার্টির একটা এ্যাসেট্ হ'বে। হয়ত রণজিৎ পাকৃড়াশীর মতো আমার বর্তমানে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য না থাকৃতে পারে, কিন্তু আমার আন্তরিকতায় তুমি কোনদিনই সন্দেহ করৃতে পারৃবে না।

সানন্দা নাটকীয় ভংগিতে কমরেডের হাতের মুঠির ভিতর থেকে নিজেকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়াল, বল্‌ল, এইবার যেতে হয়। অতিথিরা আবার খোঁজাখুজি শুরু করৃলেই বিপদ।

হলে ফিরে এসে সানন্দা দেখ্‌ল, জয়তী কিছুক্ষণ আগে মাথা ধরেছে বলে সরেছে, আর রণজিৎ প্রস্তর মূর্তির মতো কঠিন মুখে অতিথি সৎকারে ব্যস্ত।

সানন্দা চারিদিকের আবহাওয়া লক্ষ্য করে নিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

জয়তী নিজের ঘরের আলো নিভিয়ে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরের জ্যোৎস্নালোকিত বাগানের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু বাগানের দিকে তার লক্ষ্য নেই, নিচের হলঘর থেকে ভেসে কলরব আর অট্টহাস্য কানে পৌছায় না, এখনও উৎসব শেষ হয়নি, অতিথিরা একে একে চলে যাচ্ছেন, তাঁদের গাড়ির বিচিত্র আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আর চোখ ঝল্সানো হেড্ লাইটের আলো এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়্ছে। জয়তীর উৎসবের আনন্দ কোলাহল ভালো লাগেনি তাই সে পালিয়ে এসেছে।

জয়তীর চিন্তার আর শেষ নেই, সীমা নেই, আজ সন্ধ্যার ঘটনা-বলী একে একে তার মনে ভেসে এল, কিছুক্ষণের জন্য টুটুলের সান্নিধ্য স্মরণ করে সে আবার রোমাঞ্চিত হ'ল, তারপর সানন্দা ও কমরেডের সেই প্রেমবিহ্বল ভংগী, সানন্দা বিশ্বজগৎ ভুলে কি ভাবে কমরেডের বাহুলগ্ন হয়ে বসে আছে, জয়তী ভেবে পায় না, মানুষ কি করে এত নির্লজ্জ এত উচ্ছৃঙ্খল হতে পারে। স্বামীর বাড়িতে বসে অপর পুরুষের সঙ্গে এইভাবে বসা, বিশেষতঃ আজকের সন্ধ্যায় কি ভয়ংকর দুঃসাহসিক, ও নির্লজ্জ তা কি সানন্দা বোঝে না, যদি অতিথিদের মধ্যে কারো চোখে পড়ত?

জয়তী সহসা বুঝ্লো সানন্দা ও টুটুলের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া অসম্ভব। সানন্দা অনেকদূর চলে গেছে। তার আর ফিরে আসা সম্ভব নয়। বিনিময়ে টুটুলও হয়ত অন্য মেয়েদের নিয়ে এইভাবে

প্রেমলীলা সুরু করতে পারে। সানন্দা উদার চিত্তে তা হয়ত ক্ষমা করবে—কারণ তাহ'লে সানন্দার নিজের ঘটনার একটা ভারসাম্য রক্ষিত হবে। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের মধ্যে এতটুকু বাধ্য বাধকতা নেই, যে যার মনোমত পুরুষ ও রমণী নিয়ে ঘোরা ফেরা করবে। এও ত' এক রকমের বোঝা পড়া। কেউ কারো সমালোচনা করতে পারবে না।

সেই কারণেই অবস্থা ক্রমশঃ জটিল হয়ে আসছে, জয়তী আর টুটুলের এক হয়ে যাওয়ার সুযোগ খুব বেশি, বাধা একান্ত কম, একমাত্র ব্যক্তিগত মনোভংগী ছাড়া আর কোন বাধা নেই। টুটুলের বিবাহ, সানন্দার কাছে কিছু নয়, সানন্দার কোনো নিজস্ব নীতি নেই।

এই বিচিত্র পরিবেশে জয়তীর থাকা চলবে না, তার পথ এ নয়, এখনই এই মুহূর্তে এই "মনজিল" ছাড়তে হবে। সকালের জন্য অপেক্ষা করা চলবে না। টুটুলের সঙ্গে আর দেখা করার প্রয়োজন নেই, সানন্দার কাছেই বা আবার কি ভাবে মুখ দেখান যাবে—তারপর কি উত্তর দেবে সে সানন্দার অসংখ্য অবান্তর প্রশ্নের? একটা মিথ্যা ঢাকতে গিয়ে হয়ত একশোটা মিথ্যা বলতে হবে, কারণ সানন্দাকে সত্য কথা বলে লাভ কি। "মনজিল" ছাড়ার প্রকৃত কারণ কি বলা যাবে? উৎসবের কোলাহল থামলেই জয়তী "মনজিল" ছাড়বে। সানন্দাকে একটা ছোট্ট চিঠিতে সব জানিয়ে দিলেই চলবে। এখনই জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে হবে। জয়তী মনস্থির করলো।

জয়তী জানালার পাশ থেকে সরে গিয়ে দরজার ধারে ইলেক্ট্রিক আলোর সুইচ টিপল, তৎক্ষণাৎ উজ্জল বৈদ্যুতিক আলোর জ্যোতিতে ঘরটি আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠল। জয়তী একটু দাঁড়ালো, তার দুটি চোখ জলে ভরে এসেছে।

জয়তীর জিনিষপত্র সামান্যই। স্যুটকেশ বোঝাই করার সময়েই নিচের মোটরগুলির বিচিত্র হর্ণ শোনা যেতে লাগল। জয়তী বুঝলো পার্টি ভাঙ্‌চে, শীগ্‌গিরই কলরব থাম্‌বে, আরও ঘণ্টাখানেক পরে জয়তীর "মন্‌জিল" ছাড়ার সুবিধা হ'বে। জয়তী স্যুটকেশটি সরিয়ে রেখে সানন্দাকে চিঠি লিখতে বস্‌ল, স্থির কর্‌ল চিঠিতে কোনো কিছু কারণ না দেখালেই চল্‌বে—কারণ তেমন কোনো জোরালো কারণ মনে এলনা, আর সানন্দার হাতে চিঠি পৌছবার অনেক আগেই সে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছবে। সানন্দা যা মনে করে করুক, সে কথা ভাব্‌বার অবসর জয়তীর নেই—জয়তী লিখ্‌ল :—

দিদিমণি,

চিঠিটা পেয়ে আশ্চর্য হ'বে তুমি, হঠাৎ তোমাদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে তাই আমিও দুঃখিত, আমি এখনই চলে যাচ্ছি। কেন কি জন্য তা তোমাকে জানাতে পারছিনা বটে, তবে একটা ভীষণ জরুরী কারণ রয়েছে, আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো—

তোমার জয়া—

ঘড়িতে দুটো বাজ্‌ল, জয়তী আলো নিভিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল, আর দেরি করার মানে হয় না। চাঁদ ডুবে গেছে, বাইরে বেশ অন্ধকার। জয়তীর হাতে টর্চ ছিল, টর্চ জেলে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। বাইরে যে টেবিলে সাধারণতঃ চিঠিপত্র এসে পড়ে সেইখানে জয়তী সানন্দার নামাঙ্কিত চিঠিখানি রেখে দিল। কেউ লক্ষ্য করে সানন্দার হাতে পৌছে দেবে।

টর্চের ক্ষীণ আলোকে প্রকাণ্ড হল ঘরটি কেমন যেন অদ্ভুত বিসদৃশ মনে হলো।

পিছনের ভারি দরজাটা বন্ধ করে জয়তী মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস

ফেল্‌ল, আবার যেন সে মুক্তির মুক্ত বায়ু সেবন করল, 'মন্‌জিলে' তার মন যেন বন্দী হয়ে ছিল। গ্যারেজের দিকে জয়তী সোজা এগিয়ে চল্‌ল, এইখানে তার "বেবী" তার মতই বন্দী হয়ে আছে। জয়তী 'বেবী'কে কার্যকরী করে নিয়েই তার নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে বেরিয়ে পড়্‌ল—পিছনে পড়ে রইল সানন্দা, আর টুটুলের তাসের প্রাসাদ "মন্‌জিল"।

জয়তীর গাড়ির হুড ফেলা রয়েছে, পুরাতন শহরের দিকে জয়তীর বেবী ছুটে চলেছে, দিল্লীর আকাশতলে মধ্যরাত্রির মধুর গন্ধ জয়তীকে আকুল করে তুল্‌ল, সামনের রাস্তাটি আলোছায়ায় খেলায় যেনএ কটি বিরাট শাড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে, জয়তীর জয়যাত্রার পথে কারা যেন এই অপূর্ব শাড়িখানি বিছিয়ে দিয়েছে। ঘুমন্ত শহর—ধরণী কত শান্ত, কত সুন্দর মনে হচ্ছে, যেন এক অপূর্ব সঙ্গীত।

এই সুরে জীবন যদি ছন্দিত হ'ত, এই সুরের গুঞ্জরণে যদি মুখরিত হয়ে উঠ্‌ত জীবন রাগিনী, জয়তী ভাবে, তাহ'লে কি মধুর-ই না হয়ে উঠ্‌ত জীবনের উজ্জ্বল সোনালি দিনগুলি। কিন্তু বাস্তব জগতে, বিশেষতঃ আজ রাতে কি বিশ্রী সুরই না ধ্বনিত হ'ল, যেন অপটু কণ্ঠে একটি অতি পরিচিত সুরের অপমৃত্যু। একই ভুল বারবার উচ্চারিত হ'ল, কি বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি, সংশোধনের পথ রুদ্ধ। সানন্দা ও রঞ্জিতের বিয়ে সর্বপ্রথম ভুল। রঞ্জিতের স্বার্থহীন উদারতা আর বিলাস ও সম্পদ উন্মত্ত সানন্দার মোহগ্রস্ত জীবনের একমাত্র আকর্ষণ।

তারপর জয়তীর আবির্ভাব। যদি যথাকালে এই পরিচয় ঘট্‌ত তাহ'লে হয়ত ঠিক পথেই জীবনটা চল্‌ত—একই ছন্দে দুটি জীবন

স্পন্দিত হ'ত—কিন্তু দেখা যখন হ'ল তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে—অত্যন্ত অসময়! সুর কেটে গেছে, ছন্দপতন ঘটেছে।

জয়তী আপন মনে হাস্‌লো। নিজের অদৃষ্টের জন্য হাস্‌লো। এই ভাবেই চিন্তা করে অনেক দূর সে এসে গিয়েছে, কিন্তু এখন একথা ভাব্‌বার সময় এসেছে সে কোথায় ও কেন চলেছে, সত্যই কি নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিয়েছে। তার কি কর্তব্য নেই, পথ নেই! দিল্লীর চাঁদনী চকে থাকেন পদ্মাবতী দেবী। এ অঞ্চলের কনগ্রেসের বড়দরের কর্মী। জীবনের অর্ধেক কেটেছে জেলে, এখনও হাল ছাড়েন নি, মত বদলে ত্রিবর্ণ পতাকা ছেড়ে অন্য ঝাণ্ডা ওড়াবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন নি, রাতারাতি মত ও পথ বদলে যারা হঠাৎ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হয়ে পড়ে। নজীর হিসাবে মার্কস আর এঙ্গেলস্-এর বুক্‌নী মিশিয়ে নিজেদের বক্তব্য আরো জটিল করে তোলে, পদ্মাবতী সে দলের নয়। মার্কস তাঁর পড়া আছে, স্কুল কলেজের স্বল্প মেধাবী ছাত্র যেমন নোট মুখস্থ করে পাশ করে থাকে, তেমনি মার্কসীয় দর্শনের নোট পড়ে বক্তৃতা দেওয়ার বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করেন নি, তিনি যথার্থ বিদুষী। সব রকম পড়েছেন, ভেবেছেন, অবশেষে স্থির করেছেন ভারতবর্ষের মাটিতে নতুন একটা ইজম্ জন্ম নেবে, যা স্ট্যালিনীয় রাশিয়ায় পরিশ্রুত আদি অকৃত্রিম জন-গণ মনোরঞ্জক কম্যুনিজম নয়, ভারতীয় ইজমের যোগ থাকবে এদেশের মাটির সঙ্গে, আর তার ভিত্তি হবে জাতীয়তাবাদ।

জয়তী মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে এসেছে, তিনি জয়তীর মেজদার সহকর্মি, সম-সমাজ সমিতি নামক কংগ্রেসের অন্তর্গত একটি গোষ্ঠীর পরিচালিকা। জয়তী তাঁর কাছেই যাবে, তাঁর কাছেই ত' তার ঢালা নিমন্ত্রণ রয়েছে।

জয়তীর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল, নয়া দিল্লী স্টেশনের ব্রীজ দেখা যাচ্ছে। পাহাড়গঞ্জের বাজার পাড়া এসে পড়্‌ল, কিন্তু প্রায় একশ' গজ দূরে যেন একটা ছায়ামূর্তি ইতঃস্তত: সঞ্চরণশীল। হয়ত সাহায্য-প্রার্থী, এতরাত্রে কোনো দুঃশীল ঠকও হতে পারে, শীকারের জন্য ফাঁদ পেতেছে, মধ্য রাত্রির এই নির্জন মুহূর্তে আর কি মহৎ উদ্দেশ্য মানুষের থাকৃতে পারে, জয়তীকে দ্রুতগতিতে পাশ কাটাতে হবে। এই জন-বিরল পথে এই অসময়ে কোনো সাহায্য পাওয়াই সম্ভব নয়।

জয়তী কাছে এসে পড়েছে, এখনও কর্তব্য স্থির করতে পারেনি। সহসা তার মনে হ'ল পথের ওপাশের লোকটি তার পরিচিত। সেই গৈরিক গান্ধী টুপী শোভিত কমরেড চৌধুরী। অদূরে তাঁর বিশাল স্পোর্টস্ কারটি উল্টিয়ে, পড়ে আছে? বাড়ি ফেরার পথে কমরেড নিশ্চয়ই এ্যাক্‌সিডেন্ট করে বসে আছেন। জয়তী "বেবী"কে থামিয়ে কমরেড্ চৌধুরীকে উচ্চ কণ্ঠে ডেকে বল্লে—

—চৌধুরী সাহেব, ব্যাপার কি, আপনার লাগেনি ত'?

কমরেড চৌধুরীর মুখখানি ম্লান হয়ে গেছে, ভদ্রলোক অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। জয়তীর মুখের দিকে তিনি সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন, বল্লেন:

—কি আশ্চর্য! আপনি এখানে কি করে এলেন?

জয়তী বাধা দিয়ে বল্‌ল—সে প্রশ্ন যাক্। আপনার লেগেছে কি? বলেন ত' আপনাকে বাড়ি পৌছে দিই।

কমরেড বল্লেন: না আমি ঠিক আছি, কাঁধের কাছে একটু ছড়ে গেছে, কিন্তু সানন্দা—'

জয়তীর হৃদয় স্পন্দন যেন থেমে গেল, কণ্ঠস্বর আর বেরোতে চায় না, সে অতিকষ্টে বল্‌ল সানন্দা! মানে দিদি আপনার সঙ্গে আছেন নাকি?

কমরেড চৌধুরীর এখন ভালো মন্দ বিচারের শক্তি বা অবসর নেই, এই অদ্ভুত সময়ে সানন্দা আর তিনি একত্রে থাকার ফলে জয়তী যে কিছু ভাবতে পারে সে তাঁর খেয়াল হল না। তিনি বল্লেন: হ্যাঁ, তোমাদের পার্টি শেষ হবার পর, সানন্দা বল্লে মাথা ধরেছে, আমি একটা সর্ট ড্রাইভে বেরোলাম, তারপর একটি স্পেশাল টাইপের ধাক্কায় এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে, স্পেশাল টাইপ পালিয়েছে, ওদিকে সানন্দা অচৈতন্য, কি মুস্কিলেই পড়লুম। বোধ হয় মাথায় লেগেছে, কন্‌কাসন হ'তেও পারে—

কমরেড তখনও কথা কইছেন, জয়তী গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল, প্রশ্ন করল কোথায় সে?

—ঐ ত', রাস্তার পাশেই পড়ে রয়েছে, জয়তীকে সঙ্গে নিয়ে কমরেড এগিয়ে গেলেন।

সানন্দা রাস্তার পাশে ঘাসের ওপর অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে, মুখখানি শাদা হয়ে গেছে, কপালের একপাশ কেটে গেছে, সেখান দিয়ে রক্ত গড়িযে পডছে, চুলগুলি অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে শাদা জুঁই-এর মালা দিয়ে কবরী সাজান হয়েছিল, তা ছিন্ন নিষ্পিষ্ট অবস্থায় ইতঃস্তত: ছড়িয়ে আছে, ঠোঁঠ দুটি একটু একটু নড়ছে।

জয়তী বলল—কোথায় একটু জল পাওয়া যায় না? দেখুন না ঐ সোডাওলার দোকানটায় এখনও আলো জলছে।

কমরেডের চৈতন্য হ'ল, কমরেড তাড়াতাড়ি সোডা নিয়ে এলেন, সানন্দার মুখে কথা ফুটল, অস্পষ্ট মৃদু কণ্ঠে বলল—চৌধুরী, চৌ-ধু-রী—

এ আকুল আহ্বানে কমরেড চৌধুরী স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে

সানন্দার পাশে বসে তার মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে বল্লেন—কেমন আছো নন্দা ?

সানন্দা কিন্তু তখনই আবার চেতনহীন হয়ে পড়্‌ল।

জয়তী আর বেশী কথা না কয়ে বল্‌ল—আমি "মন্‌জিলে" ফিরে গিয়ে মিঃ পাকড়াশীকে ডেকে নিয়ে আসি, তিনি তাঁর বড় গাড়ি নিয়ে এসে দিদিকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত কর্‌বেন। আমার এই ছোট্টগাড়িতে ত' আর দিদিকে নিয়ে যাওয়া চল্‌বেনা, রাস্তায় ঝাঁকানি লাগ্‌বে!

চৌধুরী আগ্রহভরে বল্লেন—তাই করুন, তাড়াতাড়ি আস্‌বেন কিন্তু, আঘাতটা হয়ত সিরিয়াস্‌!

সহসা চৌধুরীর জন্যে জয়তীর মনে অনুকম্পা হ'ল, লোকটিকে অত্যন্ত অসহায় ও উদ্বিগ্ন মনে হ'ল—হয়ত খুব বেশী শকৃড। তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্য জয়তী বল্‌ল—তেমন সিরিয়স্‌ না হতেও ত' পারে? আপনি নার্ভাস হবেন না! ওকে কোনোরকমে বাড়ি নিয়ে যেতে পার্‌লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যত শীগ্‌গির পারি, ফির্‌ব, বরং এক কাজ করুন আমার গাড়িতে একটা খদ্দরের চাদর আছে দিচ্ছি, পায়ে চাপা দিয়ে দিন।

জয়তী তার বেবী-কার থেকে একটা খদ্দরের চাদর এনে চৌধুরীর হাতে দিয়েই "বেবী"র মুখ "মন্‌জিলে"র দিকে ফিরিয়েই সোজা চলে গেল।

পার্টির কোলাহল থামবার পর রঞ্জিতের বিছানায় ফেরার বাসনা হ'ল না,—চোখে তার ঘুম নেই, মাথায় যেন একসঙ্গে অনেক চিন্তা এসে ভিড় জমিয়েছে। জয়তীর মতো রঞ্জিৎও নিজের ঘরটিতে চুপ করে বসে সন্ধ্যার অম্লমধুর অভিজ্ঞতার কথা ভাব্‌ছে। জয়তী হয়ত

আজকালের ভিতরই 'মন্‌জিল' ছাড়্‌বে তারপর এই জয়তী-হীন সংসারের কি অবস্থা দাঁড়াবে? রঞ্জিতের বা দিন কি করে কাট্‌বে কে জানে? জয়তী ত' বলেছে যত শীগ্‌গীর পারে সে চলে যাবে, এভাবে থাকাও মুস্কিল, একই বাড়িতে থাকবে, বুকে অদম্য প্রেমাবেগ, অথচ সে কথা প্রকাশের উপায় নেই।

তবে জয়তী চলে গেলে অবস্থা আরো খারাপ হয়ে উঠবে, আরো কষ্টকর, আর বাড়িতে ইতঃস্ততঃ পরিভ্রমণশীল জয়তীকে দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়াটাই কি কম দুর্দশা।

সানন্দার কি হবে? সানন্দা কি করবে? সানন্দার উচ্ছৃঙ্খলতা মনে মনে একটা দুশ্চিন্তার কারণ ছিল বরাবর, আজ সন্ধ্যায় তাকে অপরের কণ্ঠলগ্ন দেখে মন বিষিয়ে উঠেছে। পার্টি ভাঙার পর সানন্দা যে চৌধুরীর সঙ্গেই বেরিয়েছে সে খবরও রঞ্জিৎ জানে—সবাই চলে যাবার পর সানন্দাকে চৌধুরীর গাড়িতে উঠ্‌তে রঞ্জিৎ নিজেই দেখেছে ওপর থেকে, সানন্দা স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা রাখেনা, সে নারী স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী।

রঞ্জিৎ ভাব্‌তে লাগ্‌ল, একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে, শরীরও দিন দিন খারাপ হয়ে উঠ্‌ছে, সকালে আবার রাইডিং সুরু করা ভালো, উপস্থিত শারিরীক ক্লান্তি না হলে ঘুম আস্‌বে না, রঞ্জিৎ তাই সেই মধ্যরাত্রে সুইমিং পুলে সাঁতার কাট্‌বে স্থির করল।

সুইমিং কস্ট্যুম পরে রঞ্জিৎ বাগানে নাম্‌বে এমন সময় একখানি মোটরের আওয়াজ শোনা গেল, সানন্দা ফিরছে নাকি, কিন্তু চৌধুরীর মোটরের আওয়াজ ত' এমন নয়, রঞ্জিৎ বিহ্বল হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে রইল, এতরাত্রে কে আবার এল, রঞ্জিৎ কিছুতেই কল্পনা করে উঠ্‌তে পারে না কে এই অতিথি? তারপর সকল সংশয়ের অবসান

করে জয়তীর অতি পরিচিত "বেবী" এসে দাঁড়াল, জয়তী গাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি নেমে রঞ্জিতের কাছে দৌড়ে এসে বল্‌ল—সর্বনাশ হয়েছে, গাড়িখানা বার করে শীগ্‌গীর আমার সঙ্গে এস।

—কি হয়েছে জয়া? ব্যাপার কি? এতরাত্রে তুমিই বা কোথায় ছিলে?

—সে সব কথা পরে হবে। দিদি বেরিয়েছিলেন কমরেড চৌধুরীর সঙ্গে, পথে স্পেশাল টাইপের সঙ্গে এ্যাক্‌সিডেণ্ট্ ঘটেছে, দিদি আহত—

—এ্যাক্‌সিডেণ্ট, আঘাত কি বেশি নাকি? উৎকণ্ঠ আগ্রহে রঞ্জিৎ প্রশ্ন করল।

—তা বোঝা যায়নি, এখনও অচৈতন্য হয়ে আছেন, কমরেড চৌধুরীকে সেখানে রেখে এসেছি।

বিব্রত রঞ্জিৎ বল্‌লে—আমি এখনই আস্‌ছি, তুমি বরং টেলিফোন ডিরেকটারী দেখে ডাঃ মৈত্রকে একবার রিং করে এখানে আস্‌তে বলে দাও, বেয়ারাগুলোকে সানন্দার ঘরে গরম জলটল সব রেডি করে রাখ্‌তে বল, আমি দু মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে বেরোচ্ছি।

যেভাবে টুটুল সংবাদটি গ্রহণ করল, যে রকম ক্ষিপ্র গতিতে সমস্ত বিষয়টি সে মানিয়ে নিল, মনে মনে জয়তীকে তার প্রশংসা করতে হ'ল। কোনো অকারণ অবান্তর প্রশ্ন নয়, এতটুকু উষ্মা প্রকাশ নয়, মুখে এতটুকু আতঙ্কের চিহ্ন নেই—ঠাণ্ডা মাথায় কেমন বুদ্ধিমানের মত সমস্ত বিষয়টি বুঝে নিল। টুটুলের মত লোক দেখলে মনে নিরপত্তা সম্বন্ধে আর সংশয় থাকে না।

কয়েক মিনিট পরে ঘটনাস্থলে যাবার সময় গাড়িতে জয়তী টুটুলকে সব কথা জানালো, কেন সে এই রাতে বাইরে গিয়েছিল, কি

কারণে সে কাউকে না জানিয়েই "মন্‌জিল" ত্যাগ করেছিল, পার্টির সম্বন্ধে একটু আভাষ, ও পথের এই দুর্ঘটনা সবই সে খুলে বল্‌ল।

এখন জয়ন্তী বুঝ্‌লো, 'মন্‌জিল' ছাড়া খুব সহজ হবে না, সানন্দা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তার কোথাও যাওয়া চল্‌বে না, সানন্দা যদি শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে, তাহ'লে জয়ন্তীর সাহায্যের প্রয়োজন হ'বে। এখন দেখা যাচ্ছে বিধাতা পুরষের চক্রান্তে জয়ন্তীকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই মন্‌জিলেই থাকৃতে হ'ল।

দ্রুতগতিতে চালিয়ে রঞ্জিতের রথ ঘটনাস্থলে তাড়াতাড়ি পৌছল। এইখানেই কমরেড চৌধুরীর গাড়ি উল্‌টিয়ে পড়ে আছে। রঞ্জিৎ গাড়ি থেকে নেমে কমরেডকে একরকম উপেক্ষা করেই সানন্দাকে নিজের গাড়িতে তুলে শুইয়ে দিল।

সানন্দার এখনও চৈতন্য ফেরেনি, কমরেড একটু অপ্রস্তুত এবং অপ্রতিভ হয়ে গেছেন, কিছুই তার বলার নেই, তাঁকে কেউ কিছুই বল্‌ছে না, তিনি নিজেই সাম্‌নের সিটে উঠে বস্‌লেন, জয়ন্তী ভিতরে সানন্দাকে আগ্‌লে রইল।

ফেরার পথে কারো কণ্ঠে আর কথা নেই, কেবলমাত্র ইঞ্জিনের শব্দ, আর সানন্দার কাতোরক্তি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, গাড়ির হাওয়ায় তার একটু করে চৈতন্য ফিরে আসছে, কিছুক্ষণ পরে সানন্দার কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল—"চৌধুরী, চৌ-ধু-রী", বিরক্ত রঞ্জিৎ ওষ্ঠপ্রান্ত দংশন করল।

"মন্‌জিলে" পৌছে রঞ্জিৎ নিজেই সানন্দাকে দুহাতের ওপর শুইয়ে, ওপরতলায় সানন্দার ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল।

সারা বাড়ি আবার আলোকোজ্জল হয়ে উঠেছে, দাসী, চাকর, বেয়ারা খানসামা, সবাই উঠে পড়ে ব্যস্ত হয়ে ইতঃস্ততঃ বিচরণশীল। সেই মধ্যরাত্রে বাড়িটিতে ব্যস্ততার আর সীমা নেই।

রঞ্জিৎ সোফারকে ডেকে বল্লে চৌধুরী সাহেবকে বাড়ি পৌছে দিয়ে এস। চৌধুরী সাহেবের হয়ত তেমন ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এর ওপর আর কথা চলে না, তিনি ম্লান মুখে নীরবে নেমে গেলেন। জয়তী সানন্দার শয্যাপ্রান্তে বসে রইল, যদি পরিপূর্ণ চৈতন্য ফিরে আসে।

ডাঃ মৈত্র এলেন, জয়তী তাঁকে আগে দু একবার দেখেছে, 'মমজিলে' তিনি মাঝে মাঝে এসে থাকেন, প্রয়োজনে অ-প্রয়োজনে। পার্টিতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন, জয়তী লক্ষ্য করেছে। এ পরিবারের তিনি একজন বন্ধু।

জয়তী মনে মনে ভাব্‌তে লাগল, সানন্দার সবই অদ্ভুত, বেছে বেছে ডাক্তার বন্দোবস্ত করেছে, তরুণ ও প্রিয়দর্শন। এখানে কুশ্রী কোনোকিছুর সমাদর নেই। অসুখের চিকিৎসাকালেও ডাক্তারের রূপ বিচার আছে।

ডাঃ মৈত্র পাকা ও চট্‌পটে, রোগীর ঘরে তিনি তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিতে জানেন—জয়তী তাঁকে সাহায্য করতে লাগ্‌ল।

পরীক্ষা করে দেখা গেল সানন্দার ডান পাটি ভেঙেছে, সেট করা দরকার। মাথার আঘাত তেমন সিরিয়স্‌ নয়, শিগগিরই সানন্দার কন্‌কাসনের ঘোর কাটবে। কিন্তু পায়ের জন্য কিছুকাল বিছানায় পড়ে থাক্‌তে হবে।

পরদিন প্রাতে "মন্‌জিলের" সর্বত্র একটা থম্‌থমে ভাব বিরাজ করতে লাগল, গৃহকর্ত্রীর নৈশ দুর্ঘটনার কথা সর্বত্র আলোচিত হতে লাগ্‌ল। সানন্দা তখনও ওষুধের ক্রিয়ায় নিদ্রামগ্ন, জয়তী সেই রাত থেকে পাশে বসে আছে, ঘর ছেড়ে ওঠেনি। রঞ্জিৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত সারা বাড়িটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চাকর বেয়ারারা গত রজনীর পার্টির উচ্ছিষ্টাদি সাফ করছে, ঘরদোর আবার যথারীতি সাজিয়ে রাখ্‌ছে।

সানন্দার এই এ্যাক্‌সিডেণ্ট সত্বেও যদিও জয়তী চলে যেতে পারত, কিন্তু সানন্দার জন্যই তা সম্ভব হ'ল না, চৈতন্যলাভের পর সানন্দাই জয়তীকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাসভরে বল্লে, তুই এখন যাস্‌নি ভাই জয়া। একমাত্র তোকেই এখন আমার একান্ত প্রয়োজন। হাঁসপাতালের ভাড়াটে নার্সে আমার চল্‌বে না, নার্স দেখ্‌লে আমার গা জ্বালা করে, তাদের নার্সিং তেমনই প্রাণহীন ভাড়াটে। যেন মানুষই নয় মেশিন, আবার যদি আমাকে পা নিয়ে উঠে দাঁড়াতে হয় তাহ'লে আমাকে তোকেই দেখ্‌তে হবে, অন্য কারো কাজ নয়, তোকে আমার চাই।

জয়তী ইতঃস্ততঃ করল। গতরাত্রে টুটুল তাকে আবার ধরেছিল, জয়তী তখনই স্থির করেছিল, আন্দোলন শুরু হোক আর নাই হোক্, সে এখান থেকে চলে গিয়ে পার্টির অফিসে উঠ্‌বে। টুটুলের কাছাকাছি আর থাকা যায় না, বেশিদিন থাক্‌লে জয়তীকে ধরা দিতে হবে হয়ত। সানন্দা জয়তীর এই দ্বিধা লক্ষ্য করে বলল ঃ

"তুই কি আমার কাছে থাক্‌তে চাস্‌না? কোনো আপত্তি আছে?"

জয়তীর গাল লজ্জায় লাল হয়ে এল, সে বলে—না তা নয়, থাকব বৈকি, তবে—

—ডাঃ মৈত্র ত' তোর সামনেই বল্লেন—তোকে না হ'লে চল্‌বে না, কাল রাতে তুই নাকি ওয়ানডারফুলি ম্যানেজ করেছিস্।

—বাবার কাছে কিছু কিছু শিখেছিলাম, জয়তী ম্লানমুখে বল্‌ল, —নার্সিং আমার ভালো লাগে দিদি, কিন্তু—

—কিন্তু কিরে ? সানন্দা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, তারপরেই যন্ত্রণাসূচক কাতরোক্তি করে বল্লে—পা টায় ভীষণ যন্ত্রনা হচ্ছে।

এই কাতরোক্তি এবং চোখের কোণের কালো দাগেই সানন্দার রোগ যন্ত্রণা বোঝা যায়। এখানে ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও দুর্দশার কথা ভুলে গিয়ে জয়তীকে এখন কিছুদিন থেকে যেতেই হবে।

সানন্দার হাত ধরে জয়তী বল্লে—না আমি এখন যাবনা, আমার নার্সিং-এ যদি তোমার উপকার হয়, যদি তুমি আমাকে চাও, আমাকে থাকতেই হবে—

কিছুক্ষণ পরেই সানন্দা আবার আচ্ছন্ন হয়ে তন্দ্রামগ্ন হয়ে পড়ল, জয়তী এই অবসরে স্নান সেরে কপালে একটি সিঁদুরের টিপ পরে, বাগানে গিয়ে গাছের তলায় বস্‌ল, কাল থেকেই মাথাটা ধরে আছে, একটু উন্মুক্ত বাতাস আর সূর্যালোক প্রয়োজন। গত কাল সারাদিন পার্টির আয়োজনেই কেটেছে, রাতে এই কাণ্ড। বিশ্রামের এতটুকু অবসর পায়নি জয়তী।

জয়তী অবসন্ন হয়ে পড়েছে, চোখদুটি ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আস্‌ছে। সানন্দাকে সেবা করতে তার এতটুকু আপত্তি নেই, সেবাতেই তার আনন্দ, সানন্দা যে তাকেই চায় এতে তার মন আনন্দে ভরে উঠেছে, কিন্তু মুস্কিল টুটুলকে নিয়ে, দিনের পর দিন তাকে দেখ্‌তে হবে, চোখের সামনে থাকবে টুটুল, মানবীয় দৌর্বল্য ও হৃদয়বৃত্তি জয় করে

কি ভাবে এইখানে একত্রে থাকা চলে, দিন দিন টুটুলের ওপর তার আকর্ষণ বেড়েই যাবে কম্‌বে না।

রঞ্জিৎ বাইরে কোথায় বেরিয়েছিল, এইমাত্র ফির্‌ল—তাকেও ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে তবুও সূর্যালোকিত প্রান্তর পরিভ্রমণের ক্লেশ তার মুখের স্বাভাবিক বর্ণকে আরো রক্তিম করে তুলেছে।

জয়তীর ক্লান্ত উদ্বেগাকুল মুখখানিতে মনে মমতা জাগে, টুটুলও ব্যথিত হয়ে প্রশ্ন করল—একটু ঘুম পাচ্ছে—না জয়া ?

জয়তী শাড়ির আঁচল আঙুলে জড়াতে জড়াতে একটু সলজ্জভাবে জবাব দিল—না ত', কিছু কষ্ট হচ্ছে না !

—সানন্দা এখন কেমন ?

—ঘুমুচ্ছে, ঘণ্টাখানেক ধরে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল, এখন কিছুক্ষণ হ'ল ঘুমিয়ে পড়েছে, কদিনে যে ওর পা সেরে যাবে কে জানে ?

—এক মাস কি দেড় মাস ?

হতাশামিশ্রিত কণ্ঠে জয়তী বল্লে—তাই নাকি ! কি মুস্কিল !

গলার টাইটা খুল্‌তে খুল্‌তে ভ্রূকুঞ্চিত করে টুটুল প্রশ্ন কর্‌ল—কেন, সানন্দা তোমাকে নার্সিং-এর জন্য আট্‌কেছে নাকি ?

—হ্যাঁ, দিদির ইচ্ছা আমি তার শুশ্রূষা করি, আমাকেই চায়। আমার যাবার প্রযোজন বা ইচ্ছাটা দিদি ঠিক বোঝেনি।

—তোমার যদি যাওয়া না হয় জয়া, তাহ'লে এক হিসাবে আমি খুসী, স্বার্থপরের মতো খুসী, কিন্তু তুমি যে কারণে "মন্‌জিল" ছাড়তে চাও, সেই 'কারণ' যদি অন্য কোথায় যায়।

জয়তী অত্যন্ত করুণ গলায় বল্লে—অর্থাৎ তোমার নিজের বাড়ি থেকে তোমাকে তাড়িয়ে দেব, কেমন তাই ত—তুমিই সরে যাবে।

—বাড়ি আর আমার কাছে বাড়ি নেই জয়া, আমার কাছে এখন

অরণ্য যা ঘরও তাই। তুমি ত' সবই বুঝেছ, তবে কেন প্রশ্ন করছ?

—কিন্তু 'মন্‌জিল' তোমার খুব প্রিয় শুনেছি, ছাড়তে পারবে?

—জায়গাটা প্রিয় বটে, আবহাওয়া নয়। কি অবস্থা বোঝ দেখি একটু জ্ঞান ফিরে এলেই সানন্দা চৌ ধূ রী চৌ ধূ রী করে চেঁচাচ্ছে।

গভীর হতাশার ভঙ্গীতে জয়তী উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—দোষ কার, কেন এসব এতদিন ধরে সয়ে এসেছ?

—কেন তাত' তুমি জানো, আমরা নিজস্ব নীতিতে যে যার পথে চল্‌ব কথা ছিল, তারপর ক্রমে বুঝ্‌লাম আমার জন্য এতটুকু প্রেম বা মমতা সানন্দার অন্তরে নেই, তাকে আমি জোর করতে পারি না, ধরে বেঁধে প্রেম চলে না, আর আমি ত' করবোও না, তুমি ত' আমাকে জানো!

এতক্ষণে টুটুল জয়তীর চোখের দিকে তাকাল, এই অন্তর্ভেদী চাউনি জয়তীকে আকুল করে তোলে, অন্তরের যা কিছু রুদ্ধ আবেগ আর যেন চেপে রাখা যায় না, কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারে না জয়তী, জয়তী মাথা নিচু করে রইল! টুটুল বল্‌তে লাগল:

—জীবনে অনেক ভুল করেছি জয়া, আর সবচেয়ে বড় ভুল যখন সর্বপ্রথম মনে করেছিলাম. অন্তত কল্পনা করেছিলাম সানন্দা, ও আমার মধ্যে প্রেম সঞ্চারিত হয়েছে, এখন বুঝি সে শুধু দেহগত মোহ ছাড়া আর কিছু নয়, শীগ্‌গিরই সে মোহের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘট্‌ল। দ্বিতীয় ভুল কর্‌লাম, যখন ভেবেছিলাম একই বাড়িতে থেকে, কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থার ভাণ বজায় রেখে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে স্বতন্ত্র ভাবে যে যার নিজস্ব মতে চল্‌তে পারব, বাইরের লোক জান্‌বে সব ঠিক আছে, আমার এই দ্বিতীয় ব্যবস্থাও কার্যকরী হল না, কার্যকরী হওয়া সম্ভবও নয়, তখন কিন্তু বুঝিনি। বিবাহের অর্থ প্রেম-সখীত্ব, আর সবচেয়ে বড়

কথা একনিষ্ঠত্ব বা যাকে বলে সতীত্ব। মনে কোরোনা আমি চৌধুরীর ওপর ঈর্ষান্বিত হয়ে এত কথা বলছি, এখানে ঈর্ষার কথা ওঠেনা, কারণ সানন্দার ওপর আমার আর কোনো আকর্ষণ নেই, প্রেম নেই, তবে এ হ'ল ভালোমন্দ বিচারের কথা, কি ভালো, কি মন্দ, বিচারের জ্ঞান সানন্দার থাকা উচিত, তোমার কাছেই আমার ভালোত্বের শিক্ষা হয়েছে জয়া!

জয়তী আকুল হয়ে বল্লে—আমার অন্য কাজ আছে, সেই কাজেই নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছি তবু তোমাদের দুজনের জন্য আমি হয়ত প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হব না। কিন্তু দেখ্‌ছি আমার কিছুই করার নেই।"

টুটুল গম্ভীরভাবে বল্লে—আমার পক্ষে বোধ হয় দিন কতক বাইরে কোথাও গিয়ে থাকা ভালো, তুমি ত' জানো, একটা ইমার্জেন্সি কমিশন পাওয়া আমার পক্ষে কিছু দুর্লভ নয়।

জয়তী এ কথার কোনো জবাব দিল না নিরুত্তর জয়তী মনে মনে ভাবতে লাগ্‌ল টুটুলের এই 'ইমার্জেন্সি কমিশন' গ্রহণের অর্থ অনেক কিছু, এমন হতে পারে সানন্দা ও টুটুলের জীবনে হয়ত আর সাক্ষাৎই হবে না। এই ক্ষেত্রে হয়ত বলা যেত সানন্দার মত টুটুলও ত' উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করলেই পারে। সানন্দা যেমন নিজের পথ বেছে নিয়েছে তেমনি টুটুলও পারে নিজের পথ নির্বাচন করতে, জয়তী স্বচ্ছন্দে টুটুলের সঙ্গে মিশে যেতে পারে, কিন্তু সে কথা জয়তী ভাবতেও পারে না, সে কোনোমতেই উভয়ের মধ্যে অপর পক্ষ হয়ে উঠতে চায় না।

টুটুল জয়তীর মনোভাব বুঝ্‌লো, বুঝ্‌লো কি তার অন্তরের বাণী—সহসা হেসে জয়তীর কাঁধে সোহাগভরে হাত রেখে বল্লে—

—তুমি অত ভেবোনা জয়া,—তোমাকে আমি এর মধ্যে টানবোনা তুমি ত' আমার কাছে এখন 'ট্যাবু' হয়ে গেছ, আচরণ যতই অসহনীয় হোক্, বিবাহের এই মিথ্যা আবরণ ছিন্ন কর্‌বো না, তবে একথাও তুমি জেনে রাখ জয়তী, আমার জীবনে আর তৃতীয় নারীর স্থান নেই।

জয়তীর চোখদুটি জলে ভরে এল, টুটুল দেখল চোখের পাতার কিনারায় জল, তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে টুটুল বল্‌ল : ঐ ত' নয়, দোহাই তোমার কেঁদোনা, ঐ জিনিষটি আমার সহ্য হয় না।

—না কাঁদ্‌বো কেন ? কাঁদিনি ত'।

—কাঁদ্‌ছিলে বৈকি, তবে কি চোখে কিছু পড়েছিল ?

অপরদিকে মুখ ফিরিয়ে জয়তী বল্‌লে— তর্কে তোমার সঙ্গে পারা কঠিন, তারপর শাড়ির প্রান্ত দিয়ে নাক মুখ মুছ্‌লো।

—রোজ এই রকম তর্ক কর্‌তে পার্‌লে ত' বাঁচ্‌তাম, তোমার সঙ্গে তর্ক কর্‌তেই ত' চাই—' কথা হয়ত আরো কিছুক্ষণ চল্‌ত, এমন সময় ওপরের বারন্দা থেকে মাইয়া হাঁক্‌লো—দিদিমণি-অ দি দি ম ণি-

—মাইয়া ডাক্‌ছে, হয়ত দিদি খুঁজছে যাই

—বেচারি সানন্দা ! হয়ত যন্ত্রণা বেড়েছে, তাকে দেখো, আর সেই সঙ্গে নিজেকেও একটু দেখো জয়া।

—আমিও এই কথার পুনরাবৃত্তি কর্‌ছি—জয়তী আর টুটুলের মুখের দিকে তাকালো না, দৌড়ে ওপরে পালালো।

টুটুল সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরে ঢুকে জয়তী দেখ্‌ল, সানন্দার চোখে জল, এই প্রথম তার চোখে জল দেখ্‌ল জয়তী।

বিছানার পাশে গেল জয়তী, বল্লে—আবার কি যন্ত্রণা বাড়্ল দিদিমণি ?

সানন্দা কিন্তু বেদনায় কাতর হয়ে কাঁদছিল না, তার হাতে ছোট এক টুক্‌রো কাগজের চিঠি। সবে সেই চিঠি পড়া শেষ হয়েছে সানন্দার। জয়তীর সহসা মনে পড়্ল উত্তেজনা ও ব্যস্ততার মাঝে এই চিঠির কথা সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিল, 'মনজিল' ছাড়ার উদ্দেশে গতরাত্রে এই চিঠিই সে লিখেছিল। ডাকের চিঠির সঙ্গে এই চিঠিখানিও সানন্দার হাতে পৌঁছেচে। ছিঃ ছিঃ, কি নির্বোধের মতই না জয়তী এই চিঠিখানির অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিল. অনুশোচনায় তার অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এখন সানন্দাকে কি করে বোঝাবে—'মনজিল' ছাড়ার হেতু কি ভাবে সে জবাবদিহি কর্‌বে। জয়তী সত্যই চিন্তিত হয়ে পড়্ল।

কিছু তিক্ত, কিছু বিরক্তি ভরে সানন্দা জয়তীকে বল্ল—

—এখানে তা'হলে ভালো লাগ্‌ছে না, আমাকেই হয়ত পছন্দ হয়নি, বা মন টিঁকুছে না, যা হয় কিছু হয়েছে, আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ, অথচ বলেছিলে আমাকে তুমি ছেড়ে যাবেনা, তুমি ছাড়া আর কারো সাহায্য আমি চাইনি, সে কথা তোমার অজানা নেই, আর তুমিই যেতে চাও ? এই তোমার ভালোবাসা ?

জয়তী বিছানার প্রান্তে বসল, উত্তর দেবার চেষ্টা করল :

—আমি ত বলেছি দিদি যাবো না, ও চিঠি এ্যাক্‌সিডেন্টের আগে লেখা, যাবার ইচ্ছেই ছিল আমার, তবে এখন আর আমি যাচ্ছি না, অন্ততঃ তুমি একটু সেরে না ওঠা পর্যন্ত আমি এখানেই থাক্‌ব স্থির করেছি।

—কিন্তু কেনই বা যাবি তুই ? যাবার প্রশ্ন উঠ্‌ছে কেন ? আমি

ভেবেছিলাম এখানে তোর কোনো কষ্ট হচ্ছে না, কোনো অযত্ন হয়েছে কি? যাবার একটা হেতু আছে ত',—আমাকে বলা নেই, কওয়া নেই তুই চলে যাবি? কি হয়েছে? কেউ কিছু বলেছে? আমার কাছে খুলে বল।

একটা যথোচিত উত্তর দেবার জন্য মনে মনে হতাশভাবে চিন্তা করল জয়তী—পরে বল্লে:—এখানে যে আমার ভালো লাগ্‌ছেনা তা নয় দিদি, তুমি কিছু মনে কোরোনা, আমার কেমন সইছে না—' জয়তী চুপ করল।

—শরীর খারাপ হচ্ছে?

—না।

—তাহলে আমাকে না বলে চলে যাচ্ছিলি যে? আমার জন্যে অপেক্ষা করে চলে গেলেই বা কি দোষ হ'ত?

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর জয়তীর মনে এলনা। অবশেষে বল্ল: দিদি, ঠিক যে কেন তার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত, আমি হঠাৎ চলে যাওয়া ঠিক করেছিলুম। এমন মনে হ'ল, সকাল পর্যন্ত আর অপেক্ষা করবার মত ধৈর্য রইল না,—' এইটুকু বলে জয়তী কান্নায় ভেঙে পড়্‌ল, নিজেকে কেমন যেন অসহায়, অসার্থক মনে হ'ল তার।

সানন্দা বিস্মিত-দৃষ্টি মেলে জয়তীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তার সুন্দর মুখখানি অসন্তোষের রক্তিম আভায় উদ্ভাসিত, সে বল্ল:

—তুই কি বল্‌তে চাস্ জয়া, হঠাৎ দুপুর-রাত্তিরে তোর এ বাড়ি ছেড়ে যাবার খেয়াল চাপ্‌ল, তা যদি হয়, তা'হলে নিশ্চয়ই আমার ওপর তোর রাগ হয়েছে, বা অশ্রদ্ধা হয়েছে—'

—তা নয় দিদি, এ-তোমার ভুল ধারণা, তোমাকে আমি সত্যিই ভালোবাসি।

—তাই না বলেই পালাচ্ছিলি ?

জয়তী এতক্ষণে ভীষণ অপ্রতিভ হয়ে উঠেছে, একটা যথোচিত কৈফিয়ৎ তার মনে না আসায় নিজের ওপরই তার রাগ বেড়ে চলেছে —সে বল্ল : তোমার কাছে হয়ত অদ্ভুত মনে হবে, কিন্তু সত্যই আমার মনে হয়েছিল, আর আমি এখানে থাক্‌বো না, থাকা আর চল্‌বে না, মুখোমুখি তোমাকে বল্‌তে বাধ্‌বে, তাই ঐ চিঠি লিখেই গাড়ি নিয়ে সোজা বেরিয়ে পড়েছিলুম।

—বিস্মিত হয়ে সানন্দা বল্লে : তার মানে ! চলে গিছ্‌লি ? সত্যই বেরিয়ে গিছলি ? কি করে তবে এ্যাক্‌সিডেণ্টের খবর জানলি ?

—ঐ রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম, পথে কমরেড চৌধুরীর সঙ্গে দেখা, পাশেই গাড়ি আর তুমি পড়ে।

—তুই-ই তাহ'লে তোরা জামাইবাবুকে টেনে নিয়ে গিছ্‌লি ? জয়তী মাথা নাড়্‌ল।

সানন্দা বল্‌ল : ঠিক বুঝ্‌লাম না, তোর কাণ্ডটা আমার সত্যই রহস্যময় মনে হচ্ছে। এখন কিছুকাল এই ভাঙা পা নিয়ে পড়ে থাকায় মুস্‌কিল, তুই চলে গেলে কি হত বল্‌ দেখি ? লক্ষ্মী মেয়ে আর যেন এমন পাগ্‌লামি করে বসিস নি, যদি কোনো কারণে তোর যাওয়ার হেতু আমাকে বল্‌তে বাধে, কি কর্‌লে তোর ভালো লাগে, আমাকে বল্‌তে দ্বিধা করিসনি।

জয়তীর মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরোয় না, অনেক পরে সে বল্লে তোমার কিছুই কর্‌বার নেই দিদি, দরকার হ'লে বল্‌ব !

সানন্দা কি ভেবে হঠাৎ বল্লে—তুই দিনরাত্তির কি বাড়িতেই থাকিস নাকি ? সত্যি এটা আমার খেয়াল হয়নি। মাঝে মাঝে দরকার হলে বেরোবি; যদি কোনো বন্ধু-বান্ধব অর্থাৎ গোপন লাভার

থাকে তাকে সোজা এখানে নিয়ে আস্‌বি। লজ্জা কি, আজকাল আর ওসব কেউ মাইণ্ড্‌ করেনা।

—আমার কেউ বন্ধু নেই। এই কথা বলে জয়তী উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। মনে মনে শঙ্কা যদি সানন্দা তার মুখভাব দেখে মনোভাবের সন্ধান পায়।

সানন্দা আবার বল্‌ল, গোলমালের ভেতর তোকে বলা হয়নি ডাঃ মৈত্র ত' তোর ওপর খুব ঝুঁকেছেন দেখ্‌ছি, আমাকে কয়েকবার তোর কথা বলেছেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করেছেন, কাল রাত্তিরেও দেখ্‌লাম পার্টিতে তোরই আশপাশে ঘুর্‌ছেন, তা লোকটি ভালো চমৎকার মানুষ, আলাপ করে দেখিস।

এ কথায় জয়তীর মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলে গেল, জয়তী জানে পুরুষ-বন্ধুদের আবির্ভাবে সানন্দা খুসী হ'বে, সানন্দা চায় জয়তী 'মানুষ' হোক্‌ অর্থাৎ তার মত ফ্যাসান-নবীশ হয়ে উঠুক, জয়তী জানে ডাঃ মৈত্র তার সম্বন্ধে একটু উৎসাহী হয়ে উঠেছেন, গতরাত্রে উৎসাহের মাত্রা কিঞ্চিৎ বেড়েছিল, টুটুলের সঙ্গে যদি ওভাবে দেখা হ'ত, তাহলে হয়ত ডাক্তার সাহেবের হাত থেকে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতনা। কিন্তু কোনো পুরুষের কাছ থেকেই কোনো রকম ইঙ্গিত জয়তীর কাম্য নয়, একজন পুরুষকে সে ভালোবেসেছে, আকস্মিক দুর্ঘটনার মতোই অনিবার্য ভাবে অসহায়ের মত ভালোবেসেছে, যাকে সে ভালোবেসে ফেলেছে তাকে তার ভালোবাসা উচিৎ নয়, তার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়াই তার পক্ষে কল্যাণকর—সে সানন্দার স্বামী, জয়তীর জামাইবাবু, টুটুল! সানন্দা যদি জানত!

জয়তীর কিছুই বলার ক্ষমতা নেই, সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে

উঠেছে, মনে তীব্র অশান্তি ও অসন্তোষ, সে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সেইসন্ধ্যাতেই শোনা গেল জরুরী কাজে রঞ্জিৎ পাকড়াশী হঠাৎ কল্‌কাতায় গিয়েছেন।

জয়তী তাকে যেতে দেখেনি, বুঝল এই আকস্মিক তিরোধানের হেতু। বিদায়-দৃশ্য হয়ত অতিমাত্রায় নাটকীয় হয়ে উঠতে পারে, এই আশংকায় জয়তীর সঙ্গে দেখা করেনি। যদিও টুটুলের এইভাবে চলে যাওয়ার অন্তরালে যে-করুণ ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা শুধু জয়তীই জানে, তবুও জয়তী মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌ল। সেই যখন "মন্‌জিলে" অনির্দিষ্ট কাল থাকৃতে হবে, 'টুটুল-হীন' মন্‌জিল-ই বাঞ্ছনীয়।

জয়তীর অনেক কাজ, বিছানার ধার থেকে অলস সানন্দা জয়তীকে এক রকম উঠ্‌তেই দেয় না, শুধু যখন কমরেড চৌধুরী বা ঐ ধরণের অন্য কোনো অতিথি আসেন জয়তী উঠে চলে যায়, সানন্দা কোনোদিন হয়ত মৌখিক লৌকিকতা জানিয়ে বলে, বস্ না জয়া উঠ্‌ছিস্ কেন? —তবে ঐ পর্যন্ত, বেশি পীড়ন করে না। সানন্দার ঘরটি, ছবিওয়ালা 'মাসিকপত্র, সহজপাঠ্য হাল্কা গল্পের বই, আর ফুলে ভরে উঠেছে টেলিফোনে দিনরাত শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের কুশল প্রশ্নের খবরাখবর চলেছে।

জয়তী যতই সানন্দার কাজ করে দেয়, ততই সানন্দা ভাবে ও গেলে আমার কি হবে। তাই মাঝে মাঝে জয়তীকে বুঝিয়ে বলে কিছুতেই ভাই তোর এখান থেকে যাওয়া চল্‌বেনা, আমি ত' অন্ততঃ ছাড়্‌বোনা। অক্লান্ত জয়তীর আন্তরিক সেবায় সানন্দা ক্রমশই সুস্থ হয়ে উঠ্‌ছে।

রোগশয্যায় জয়তীর এই বিরাম-বিহীন উপস্থিতির ফলে ডাঃ মৈত্রের সংস্পর্শে প্রায়ই আস্‌তে হয়।

প্রথম সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিনই দুবার করে ডাঃ মৈত্র সানন্দার পা দেখ্‌তে আস্‌তেন, একটু আধটু গোলোযোগ লেগেই ছিল। তারপর রোগ যখন ক্রমে কমে এল, তখন সানন্দার নিমন্ত্রণে সন্ধ্যার দিকে বা চায়ের সময় নিয়মিত এসে হাজির হ'ন।

সানন্দা ধরে নিয়েছে জয়তীর ওপর ডাঃ মৈত্রের আকর্ষণ আছে। এই ধরণের ফ্যাসনেবল সোসাইটির মেয়েদের একমাত্র কাজ বিবাহের ঘট্‌কালি করা, অমুকের মেয়ের সঙ্গে কার ছেলের ভাল মিল হয় এই চিন্তা নিয়েই এঁদের দিন কাটে। সানন্দা চরিত্রেও এই গুণটির অভাব ছিলনা। সানন্দা তাই মনে মনে একটা রাজযোটক মিল ঠিক করে রেখেছে। যতদূর পারে ডাঃ মৈত্রকে উৎসাহিত করে, আশা দেয়, অথচ জয়তীর কিন্তু নিস্পৃহ নিরাসক্ত ভাব। ডাঃ মৈত্রের বহু নিমন্ত্রণ জয়তীকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়, সিনেমা বা কুতুবদর্শন বা ওখ্‌লা ভ্রমণ, কিংবা ডিনারের নিমন্ত্রণ লেগেই আছে। জয়তী কিন্তু কিছুতেই সাড়া দেয় না।

সানন্দা শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্চয় করছে ক্রমশঃ, ইদানীং তার মনে হচ্ছে এ বিষয়ে জয়তীর সঙ্গে একটা স্পষ্ট বোঝাপড়া প্রয়োজন। সানন্দা সেদিন সকালে উঠে পিছনে তিন চারটি বালিস দিয়ে বসেছে, সামনে প্রাতঃকালীন চায়ের সরঞ্জাম, এ সময়টা জয়তী এসে বসে,—দু চারটি কথা বলে, সানন্দার চিত্ত-প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করে।

সানন্দা হঠাৎ বল্‌ল—আচ্ছা জয়া একটা কথা বল্‌বো, রাগ করিস্‌নি যেন, ডাঃ মৈত্রকে তুই দেখ্‌তে পারিস্‌না কেন? কাল সন্ধ্যায় ভদ্রলোক যেন অত্যন্ত আশাহত হয়ে এলেন। মুখভঙ্গী দেখে কয়েকটি

প্রশ্নের পর বুঝ্‌লাম তুই-ই তার হৃদয়-দাহের কারণ—তোর জন্যই তাঁর মুখ অন্ধকার।

জয়তী সবিস্ময়ে বল্‌ল—তাই নাকি, কিন্তু কেন?

—তাঁর ভয় হয়েছে হয়ত তোকে তিনি চটিয়ে দিয়েছেন, বিরক্ত করেছেন, তুই তাঁর দিকে নাকি চেয়েও দেখিস্‌ না, নিমন্ত্রণে আপত্তি, ভ্রমণে অরুচি।

—আমার চটবার কোনো কারণ নেই, আমি হঠাৎ বিরক্ত হতে যাব কেন, তবে ওঁর সঙ্গে বাইরে বেরোবার বাসনা আমার নেই।

—কেন এই বিতৃষ্ণা? লোকটিকে তোর ভালো লাগে না? আমার ত' মনে হয় লোকটি বড় ভালো। তোর ওপর ওর টান্‌ দেখে আমিই ত' এক এক সময় জ্যেলাস্‌ হয়ে উঠি।

এই রসিকতা করে সানন্দা চোখদুটিতে অপূর্ব ভঙ্গি করে জয়তীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

জয়তী মনে মনে ভাব্‌তে লাগল:

"প্রেম, ভালোবাসা, সৌখীন পোষাকী ভালোবাসা সানন্দার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিলাস, যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে রসালাপ করা তার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। আমি কেন সব কিছু এমন সহজ ও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ কর্‌তে পারি না। কেন সেই একটি বিশেষ লোকের কথাই মনের ভেতর রেখেছি।"

অনেক পরে জয়তী বল্লে—হ্যাঁ, ডাঃ মৈত্রকে ভালোই লাগে, উনি ত' বেশ লোক।'

জয়তীর কাছে লোকটি ভালোই মনে হয়েছে, এরকম ব্যক্তির বন্ধুত্ব বাঞ্ছনীয়। কিন্তু জয়তী বুঝেছে লোকটি কোনো যেন বিশেষ কারণেই তার ওপর আকৃষ্ট হয়েছে, চোখের চাউনিতেই

এই মনোভংগী প্রস্ফুট, ছোটখাট মন্তব্য, টুকরো কথা, প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে সেই এক সনাতন প্রার্থনা জেগে ওঠে, ভালোবাসি, ভালোবেসেছি। প্রেমিক হিসাবে আর কোনো পুরুষের স্থান জয়তীর হৃদয়ে নেই। টুটুল ছাড়া আর কাউকে সে কামনা করে না, আর তাকেও সে পেতে পারে না, পাবে না। সেই আসনে আর কাকে এনে সে বসাবে?

সানন্দা বল্‌ছিল—ডাঃ মৈত্রের সঙ্গে আলাপ রাখতে ক্ষতি কি? লোকটি রসিক, তার ওপর শুনেছি অবস্থা ভালো, এদিকে দিল্লীতে পসারও বেশ জমিয়েছে—মন্দ কি!—তারপর হঠাৎ এই প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে বল্‌ল,—আজ সকালে যে তোর জামাইবাবুর চিঠি এল।

জয়তীর হৃদয় দ্রুতবেগে স্পন্দিত হ'ল। ডাঃ মৈত্র তলিয়ে গেলেন। সানন্দার মারফত জয়তী মাঝে মঝে টুটুলের সংবাদ পায়। কল্‌কাতায় সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট, আর ডি, জি, এম, পি, করেই নাকি টুটুলের দিন কাটে। যদিও টুটুল চলে যাবার পর কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে, তবু টুটুলের নাম উল্লেখে জয়তীর মনে বেদনা সঞ্চারিত হয়, এই তথ্যই ক্রমশঃই জয়তীর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ভোলা অত সহজ নয়, প্রেমের স্মৃতির দাগ বড় গভীর, এ ক্ষতের জ্বালা সহজে প্রশমিত হয় না। প্রথম দিনের পুলক স্পর্শ, সেই প্রথম চুম্বন, জয়তীর অন্তরে একটা মৃত্যুহীন আবেগ সৃষ্টি করেছে।

কণ্ঠস্বর থেকে আগ্রহের সুর যথা সম্ভব কমিয়ে জয়তী বল্লে—কেমন আছেন কিছু লিখেছেন?

সানন্দা লঘুভাবে বল্লে—কেমন আবার থাকবে ভালোই আছেন। ফুর্তিতে আছে, হোটেল, সিনেমা, জয় রাইড, এখন ত' কল্‌কাতাতেই মজা।

জয়তী তেমনই নম্র এবং অনুসন্ধিৎসু ভঙ্গীতে শুধু বল্লে—তাই নাকি!

মনে মনে আসল চিঠিখানি পড়্‌বার অদম্য আগ্রহ, তার প্রতি অক্ষর সে মুখস্থ করে রাখতে চায়।

সানন্দা বল্‌তে লাগল—কল্‌কাতা থেকে আমার আর একজন বন্ধুর চিঠিও আজ ঐ সঙ্গে এল, সে লিখেছে প্রতিমা সমাদ্দারও রয়েছে এখন কল্‌কাতায়।

—তিনি আবার কে? এই প্রতিমা সমাদ্দার?

—ওঃ তুই চিনিস্‌ না বুঝি, সেই যে ক' বছর আগে 'ইলস্ট্রেটেড ইণ্ডিয়া'র বিউটি কন্‌টেস্টে ফার্স্ট হয়েছিল, আজকাল আবার গীতশ্রী হয়েছে। কল্‌কাতা সহরে তার খুব নাম ডাক, পুরুষেরা তাকে দেখলে শুনেছি পাগল হয়, কল্‌কাতায় ঐ নাকি সব চেয়ে সুন্দরী মেয়ে। তোমার জামাইবাবুরও একটু ওদিকে টান আছে শুনেছি।

জয়তী নীরবে এই সংবাদ শুন্‌লো। এতটুকু ঈর্ষা যাতে মনে না জাগে তার জন্য চেষ্টা কর্‌ল। টুটুলই ত' তাকে বলছিল তার জীবনে তৃতীয়ার স্থান নেই। তবে সেখানে নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই বা থাক্‌বে কেন। স্বাভাবিক সৌজন্যের খাতিরেও ত' পাঁচজনের সঙ্গে মিশ্‌তে হয়। যদিও এইসব টুটুলের মনঃপুত না হয় তবু তাকে সামাজিকতার খাতিরে ভদ্রতার এই আধুনিক পোষাকে সজ্জিত হতে হবে। এই কথা ভেবে জয়তী মনকে আশ্বস্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ল, তবু সেই সঙ্গে টুটুল "কল্‌কাতার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে"কে নিয়ে ঘুর্‌ছে একথা ভাব্‌তেও যেন কষ্ট হয়।

জয়তী তাড়াতাড়ি উঠে পড়্‌ল, কোনো কথা বলার শক্তি তার নেই, পাশ কাটিয়ে পালাতে পার্‌লে বাঁচে।

সানন্দা পেছন থেকে বল্লে:—তাহলে ডাক্তার বেচারাকে একটু দেখিস্‌ বুঝ্‌লি?

জয়তী মুখ ফিরিয়ে একটু হাস্‌লো। সম্মতিসূচক হাসি।

বারান্দায় যেতে যেতে জয়তীর মনে হ'ল, কি প্রয়োজন তার অকারণে ব্যক্তিবিশেষকে উপেক্ষা করে, দুদিন পরেই ত' সে এ অঞ্চল ছেড়ে যাবে, তা ছাড়া টুটুলের কথা অন্তর থেকে মুছে ফেল্‌তে হ'লে দু একজনের সঙ্গে পরিচয়ের প্রয়োজন রয়েছে।

এদিকে সানন্দা ভাব্‌তে লাগ্‌ল তবু যাহোক মেয়েটার মনটা ফেরানো গেছে, কে জানে হয়ত এর ফলে "মন্‌জিল" থেকে উড়ে যাবার আগ্রহ জয়তীর কেটে যাবে।

এই প্রসঙ্গের কিছুদিন পরে—

ডাঃ মৈত্র ও জয়তীর মধ্যবর্তী ব্যবধান অনেকটা অপসারিত হয়েছে। সেই ব্যবধানের ওপর সেতু রচনা করেছে কুশলী শিল্পী সানন্দা। মাঝে মাঝে ডাক্তারের সঙ্গে এদিক ওদিক বেরোচ্ছে জয়তী।

খুব উৎসাহিত বোধ না করলেও নিছক সৌজন্যের খাতিরেই জয়তী ডাক্তারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে, বারবার প্রত্যাখানে হয়ত রূঢ় অসামাজিকত্বের পরিচয় দেওয়া হবে তাই জয়তী নরম হয়েছে।

তা ছাড়া টুটুলকে ভুল্‌তেই হবে, সানন্দা ক্রমশঃ সেরে উঠ্‌ছে, হয়ত আর দশ পনের দিনের মধ্যে সে উঠে বেড়াবে, তাহ'লে টুটুলের প্রত্যাবর্তনের আগেই জয়তী 'মন্‌জিল' ছেড়ে চলে যাবে, সে ক্ষেত্রে হয়ত জীবনে আর টুটুলের সঙ্গে দেখাই হবে না। অতীতকে মন থেকে মুছে ফেলবে, ফেলে আসা জীবনের মতো, এই মধুর অতীতে বিস্মরণের যবনিকা টেনে দেবে।

সানন্দা মনে মনে হাসল, বুঝ্‌ল তার কথার ফল ফলেছে, আশা করল একদিন হয়ত জয়তী ও ডাক্তারের এই বন্ধুত্ব গভীর প্রণয়ে পরিণত হবে, যার পরিণতি পরিণয়ে। সানন্দা আজকাল জয়তীকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাস্‌ছে, তার ওপর তার গভীর মমতা। তাই জয়তী জীবনটা উপভোগ করুক, এই তার বাসনা।

কম্‌রেড চৌধুরীকে একদিন সানন্দা বল্‌ল : জানো, ডাক্তার মৈত্রের কৃপায় অনেকটা বাঁচা গেছে, জয়ার ওপর তাঁর প্রবল আগ্রহ।

কমরেড ধীর ভাবে পাইপে টান দিয়ে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া ছেড়ে নির্বিকার চিত্তে বল্লেন—ঠিক বুঝ্‌লাম না, বাঁচা গেল কি হিসাবে?

—জয়া দিন দিন যেন কেমনতরো হয়ে উঠ্‌ছিল, আনমনা ভাব, কেবল উড়ু উড়ু, মাঝে মাঝে ঘণ্টাকয়েক কোথায় চলে যায়, পাত্তা পাওয়া যায় না। কখনও বলে এখান থেকে চলে যাবে, জানো, সেদিন সেই এ্যাক্সিডেণ্ট্‌ না হলে সেই রাতেই চলে যেত। সেই জন্যেই ত' আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—ও তখন পালাচ্ছিল।

তাই নাকি। তা ঐ গভীর রাত্রে চোরের মত পালাবার মানে? আমিও কথাটা ভেবেছি, জিগ্‌গেস্‌ করতে ভুলে গেছি।

সানন্দা বিলাতি কায়দায় শ্রাগ্‌ কর্‌লো। বল্লে :—ভগবান জানেন! ওর মুখ থেকে আসল কথা বের করতে পারিনি। যাই হোক্‌ অনেক করে বললুম—এই কটা দিন থাক্‌, আমার শরীরটা একটু সার্‌লে যাস্‌, এখন ডাক্তারের টানে যদি এখানে থেকে যায়। হয়ত মত বদ্‌লিয়ে এখন এখানেই থেকে যেতে পারে।

জয়তী সম্বন্ধে চৌধুরীর তেমন আগ্রহ নেই, মুরুব্বীর মত ঘাড় নেড়ে তিনি বল্লে, আমারও তাই মনে হয়, মেয়েটি এদিকে ত' ভালোই মনে হয়।.

—শুধু ভালো? না হলে চলেনা, সানন্দা মধুর হেসে বলল।—আমার সব কাজ ত' সেই-ই করে। আমার অত সময় কই?

চৌধুরী উৎসাহিত হলেন, সানন্দার সঙ্গে দীর্ঘকাল মিশে তিনি বুঝে নিয়েছেন তার কোন্ কথায় কখন কি ভাবে সায় দিতে হবে। বল্লেন: তা'হলে নন্দা, আমি প্রার্থনা করি, ডাক্তারের শ্রম সার্থক হোক্, বাণবিদ্ধা জয়ন্তী তোমাদের এই 'মন্‌গিল' অলঙ্কৃত করে বিরাজ করুক।

সানন্দা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠ্‌ল,—বেশ নাম ত', 'মন্‌গিল'। কি যেন মানে তোমার?

—অর্থাৎ মনকে গিলে রাখে। মন্‌গিল!—কমরেড রসিকতা করে জবাব দিলেন।

সানন্দার কণ্ঠে হাসির রেখা ফুরোয় নি, তবু গাম্ভীর্যের ভাণ করে বল্লে:—কিন্তু ও কথা যেন পাকড়াশীর কানে না ওঠে, তাহ'লে আর রক্ষা থাক্‌বে না। 'মন্‌জিল' তার ধ্যান জ্ঞান, 'মন্‌জিলে'র জন্যই পাগল।

—আস্‌তে ত' দেরি আছে, আর কল্‌কাতা থেকে ফেরার আগেই আমার আশা আছে, নন্দা আমার কাছেই চলে আস্‌বে।'

সানন্দা প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানালো, আবার গম্ভীর হয়ে বলল—না, চৌধুরী, তুমি বোঝোনা, 'মন্‌জিল' ছাড়া এখন চলে না, অনেক জটিলতা আছে এর ভেতর, শুধু পাকড়াশী নয়, আরো অনেক দিক রয়েছে ভাববার—'

লঘুভাবে সানন্দা থাম্‌লো, কি যে অনেক দিক তা বিস্তারিত ভাবে বলা শক্ত এবং নিরাপদ নয়, সেই জন্যেই 'জটিলতা' কথাটিকে আন্‌তে হয়েছে এর ভেতর।

অতঃপর ক্ষুন্নকণ্ঠে চৌধুরীকে বল্‌তে হ'ল—কিন্তু যদি কোনোদিন তোমার মত বদ্‌লায় তখন আমাকে স্মরণ কোরো।

সানন্দা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল, স্বস্তির নিশ্বাস না হতাশার অভিব্যাক্তি কে জানে, মৃদু গলায় শুধু বল্ল—জয়া আর ডাক্তারের মত আমাদের ব্যাপারটা যদি অমনই সহজ ও সরল হ'ত—'

সানন্দা তখনও জানে না জয়তী আর ডাক্তারের মধ্যবর্তী প্রীতির সম্পর্ক কতখানি "সহজ ও সরল" হয়ে উঠেছে।

প্রথম দু একদিন ডাক্তারের সাহচার্যে জয়ন্তীর সন্ধ্যাটি বেশ কাট্‌লো ডাক্তারের ব্যবহারে এতটুকুও বোঝা যায়নি এই সখ্যতার মূলে সম্পূর্ণ প্লেটনিক ভিত্তি ছাড়া আর কিছু আছে, সুতরাং জয়ন্তীর আড়ষ্ট ভাব কাট্‌লো, সহজেই তার স্বাভাবিক সারল্যের রূপ প্রকাশ পেল, জয়ন্তী এই নৈবক্তিক, দেহাতীত বন্ধুতা সাগ্রহে গ্রহণ করলো। এদিকে টুটুলের সম্পর্কে অন্তরকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তোলবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। টুটুলের অনুপস্থিতে ডাক্তারের সাহচার্যে সন্ধ্যাযাপনের জন্য তার মনে এতটুকু অনুতাপ জাগেনি, কারণ শোনা গেছে টুটুল কল্‌কাতায় প্রতিমা সমাদ্দারকে নিয়েই ব্যস্ত আছে।

টুটুল যে অপর কাউকে নিয়ে মোহগ্রস্থ হয়ে পড়বে, এ আশঙ্কা জয়ন্তীর নেই। টুটুল বারবার জানিয়েছে তার জীবনে তৃতীয়ার স্থান নেই, টুটুলের সেই কথায় জয়ন্তীর অখণ্ড শ্রদ্ধা আছে। তবু যদি টুটুল মনে করে থাকে প্রেমের ট্র্যাজেডির বেদনা বুকে বহণ করে বেড়ানো মিছে তাতেও জয়ন্তীর ক্ষোভ নেই। জয়ন্তীর পথ অন্য—সে শুধু মাঝপথে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করছে, জগৎ সংসার দেখছে, জীবনের যাত্রাপথে ঠিকানা থেকে ঠিকানান্তরে যাবার সময় পথের মাঝে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়েছে।

এর ভিতর আর প্রেম নেই, প্রয়োজনও নেই, ডাক্তারের জন্য মনের কোণে স্থান কই? আস্‌লে আর কারো সঙ্গে প্রেম করার

অবসর জয়তীর জীবনে নেই। ডাক্তার নবীন যুবক, শিক্ষিত, সম্ভবতঃ মার্জিত, ও সুদর্শন। তবু জয়তীর মনে মনে একটা দুঃখবাদের মনোভংগী বর্তমান, কোথায় গেলাম, বা কোথায় এসেছি এ চিন্তার অবসর তার নেই, সে শুধু অনাগত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে। মহা-ভারতের অর্জুনের মতো পাখীর আর কোনো অংশ না দেখে শুধু চোখের দিকেই লক্ষ্য রেখেছে। সংগ্রাম সুরু হলেই সে একটা অংশ নেবে, মেজদার কাছে সেই প্রতিশ্রুতি সে দিয়েছে, আর পোষা পায়রার মত সেই নির্দেশেই সে মানবে, তার মধ্যে কি, কেন, কোথায়, এই সব প্রশ্নের ফাঁক নেই।

ডাক্তারের সঙ্গে সিনেমা বা কফি হাউস, নৃত্যনাট্য বা ওখলা ভ্রমণের গুরুত্ব, জয়তীর কাছে কিছু নেই, এখন "মন্‌জিলে" থাকাও যেমন নিরর্থক, এও তেমন অর্থহীন। ডাক্তারের কথা বলার ভঙ্গি চমৎকার, জয়তীর ওপর তার ব্যবহারও মলায়েম, আর টুটুল সম্পর্কিত আঘাতটি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়, এ ছাড়া এই ডাক্তারের সংসর্গে জয়তীর আর কিছুই স্বার্থ নেই।

এই আবহাওয়া বেশি দিন কিন্তু রইল না, সময়ের সঙ্গে শীঘ্রই জয়তী বুঝ্‌লো তার ওপর ডাক্তারের এই প্রীতি নিছক 'প্লেটনিক' মনোভাব নয়, সময় ক্রমশঃই আসন্ন হয়ে আস্‌ছে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার।

জয়তীর এই আশঙ্কা শীঘ্রই সত্যে পরিণত হ'ল।

শহরের রঙ্গমঞ্চে বাংলাদেশ থেকে একদল সৌখীন শিল্পী এসে নাচগানের আয়োজন করছিলেন—নৃত্যনাট্যের আসর খুবই জমেছে। ডাক্তারের বহু পরিচিত বন্ধু এই দলের সদস্য, সুতরাং ডাক্তার জয়তীকে বুঝিয়ে রাজী করেছেন।

নৃত্যনাট্য খুবই উপভোগ্য হল, কিন্তু অভিনয় অন্তে ডাক্তারের কথা জয়তীর কানে কেমন বেসুরো ঠেক্‌ল, জয়তী শঙ্কিত হল, অন্য দিনের চাইতে আজ যেন ডাক্তার কেমন গভীর ও চটুল হয়ে উঠেছেন, কেমন যেন অন্তরঙ্গ ভাব।

জয়তী বিস্মিত হয়নি, এমনই একটা সম্ভাবনার কথা মনে মনে কিছুকাল আগেই কল্পনা করেছিল। তাই যখন প্রত্যাবর্তনের পথে ডাক্তার সহসা বড় রাস্তা ছেড়ে দিয়ে অন্ধকারমগ্ন একটা নির্জন জনবিরল পথের ধারে গাড়ি থামিয়ে হেড লাইট নিভিয়ে দিলেন, তখন উত্তেজনায় জয়তীর হৃদয় স্পন্দিত হ'ল। জয়তী বুঝ্‌লো ডাক্তারের উদ্দেশ্য। ডাক্তার যদি প্রেম নিবেদন করেন তাহলে সে কি বল্‌বে, সেই কথাই তখন তার কাছে সর্বপ্রধান হয়ে উঠল, কিন্তু জয়তী ভাবলো ডাক্তার হয়ত অতখানি সাহস কর্‌বেন না, তার নিজেরই হয়ত ভুল হচ্ছে।

ডাক্তার জয়তীর দিকে মুখ ফিরিয়ে নীরবে কিছুক্ষণ বসে রইলেন, যেন তার অন্তরের কথা জানার চেষ্টা করছেন। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় উভয়ের দেহের প্রান্তরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জয়তীর মুখের এক অংশে ম্লান চাঁদের আলো পড়েছে, চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে। ডাক্তার জয়তীর প্রেমে আকুল হয়ে আছেন। সানন্দার মত সুন্দরী "সোসাইটি পেসেণ্ট"র সঙ্গে এই মেয়েটির যথেষ্ট পার্থক্য আছে, কে বল্‌বে উভয়ের মধ্যে একটা সম্পর্কের সূত্র বর্তমান।

সহসা নিবিড়ভাবে বাহু বেষ্টন করে জয়তীকে ধরে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বল্লেন—জয়তী!

ডাক্তার অনুভব কর্‌লেন জয়তী কাঠের মত আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

সে অত্যন্ত করুণ গলায় বল্লে—ছিঃ ডাক্তারবাবু ছেড়ে দিন, আপনার পায়ে ধর্‌ছি।

ডাক্তার বিস্মিত হলেন, ধীরে ধীরে জয়তীকে বন্ধনমুক্ত করে ডাক্তার বল্‌লেন—কিন্তু এই কুণ্ঠা কেন?

—কেন, কিজন্য বল্‌তে পার্‌ব না, তবে এ জাতীয় অন্তরঙ্গতায় আমার আপত্তি আছে।

জয়তী দুঃখিত হ'ল, ডাক্তারকে আঘাত দেবার কোনো উদ্দেশ্য তার নেই, ডাক্তারের ওপর তার মমতা আছে,

ডাক্তার কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্র ন'ন, বল্লেন : আপত্তির কারণটা কিন্তু আমার জানা উচিত! আমি তোমাকে ভালোবাসি, সে বোধ হয় নিশ্চয়ই বুঝেছ—দিন দিন তোমার সান্নিধ্যে এসে আমার সে ভালোবাসা ক্রমশই গভীর হয়ে উঠেছে, যা অন্তরে ছিল এতকাল, আজ বাইরে তার প্রকাশ হয়েছে, কেন তুমি এত নিষ্ঠুর?

জয়তী চমকিত হ'ল, তার কণ্ঠের স্বরে অন্তর্বেদনা চাপা রইলনা, সে শুধু বল্‌ল, কেন যে এই আপত্তি সে প্রশ্নের জবাব কি আপনাকে দিতে হবে? জবাব যদি দিতেই হয় তাহ'লে জেনে রাখুন ডাক্তার বাবু, আমার কাছে প্রেম নিবেদন করে আপনি ভুল করেছেন, যাকে আমি ভালবাসিনা তার সঙ্গে প্রণয়িনীর ভূমিকায় মিথ্যা অভিনয় কর্‌বো, এতবড় প্রতারক আমি নই।

এই জবাবে ডাক্তার মৈত্রের বিরক্তি ও ক্রোধের সীমা রইল না, ডাক্তারের অন্তরে আঘাতের বেদনার চাইতে ক্রোধের জ্বালা যেন প্রবল হয়ে উঠল। মেয়েটির এই রূঢ় প্রতিবাদ ডাক্তারের কাছে নিছক ন্যাকামী বলে মনে হ'ল। জয়তীর মুখের দিকে একবার বক্র ভাবে চেয়ে ডাক্তার বল্লেন—

—এখন ত' খুব সাধুগিরি দেখ্‌ছি, সেদিন কোসী কালানের হোটেলে ত' তোমার এত আপত্তি ছিল না?

জয়তীর মনে হ'ল তার হৃৎপিণ্ড হঠাৎ ঠেলে বেরিয়ে আস্‌ছে, সে যেন চেতনাহীন হয়ে পড়্‌ছে, সাম্‌নের জনহীন অন্ধকার রাস্তা আরো অন্ধকার হয়ে গেল। ভীত চকিত দৃষ্টিতে জয়তী ডাক্তারের মুখের দিকে কিছুকাল চেয়ে থেকে বল্লে—তার মানে ?

—যা মানে তা ত' তোমার অজানা নেই। সেদিন রঞ্জিৎ পাক্‌ড়াশীর কাছে ত' সহজেই ধরা দিয়েছিলে, আর আজ এই অধমের ওপর এত নির্মম হবার কারণ কি ?

জয়তীর ঠোঁটদুটি ঈষৎ উন্মুক্ত হ'ল, কিন্তু কোনো শব্দ শোনা গেল না। ভীত শঙ্কিত জয়তী পাথরের মূর্তির মত শাদা হয়ে গেছে, নিষ্পলক নেত্রে সে সামনের দিকে চেয়ে রইল। আশ্চর্য! সেদিনের খবর ডাক্তারের কানে গেল কি করে ? আর যদি সে জেনেই থাকে এখন তার উদ্দেশ্য কি ! কি সে চায় ? ইচ্ছা কর্‌লে অবশ্য সে অনেক কিছুই গোলোযোগ সৃষ্টি কর্‌তে পারে। অতিকষ্টে সে ধীরে ধীরে উচ্চারণ কর্‌ল : কি করে আপনি জান্‌লেন ? বলুন, কি সূত্রে আপনি জেনেছেন ?

ডাক্তার এতক্ষণে তাঁর ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় পুলকিত হলেন। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে এবং যথাসম্ভব মৃদুগতিতে একটা সিগারেট ধরালেন। তিনি সময় নিচ্ছেন, কারণ জয়তী যে উৎকণ্ঠ আগ্রহে সে রাত্রের কাহিনীর কতটুকু তিনি জানেন, তা জান্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে তা তিনি বোঝেন। মনে মনে তিনি ভাব্‌লেন জয়তীর সাধুতায় ভয় পাওয়ার ছেলে তিনি নন, এত সহজে তাঁকে নিরস্ত করা চল্‌বে না। জয়তীকে তাঁর ভালো লেগেছে, তাকে তাই চাই। টুটুলের বাহুলগ্না জয়তীকে সেই রাত্রে কোসী কালানের হোটেলে দেখেই ডাক্তারের এই কথা মনে হয়েছিল, আজ সেদিনের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে।

ডাক্তার স্বপ্নেও ভাবেনি "মন্‌জিলে" আবার এই মেয়েটির দর্শন মিল্‌বে। এখানে জয়ন্তীকে দেখে মনে মনে ভেবেছে রঞ্জিৎ পাকড়াশী চালাক লোক, বাড়িতেই এ দূর সম্পর্কিত শালিটিকে রেখে দিয়েছে, লোক চক্ষের সন্দেহাতীত করে, অথচ…

কিছুক্ষণ পরে কণ্ঠস্বরে যথা সম্ভব দৃঢ়তা এনে ডাক্তার বল্লেন—সেই রাত্রের ঘটনার সাক্ষী আছে, আর সেই সাক্ষীদের একজন আমি স্বয়ং। কোসী কালানের হোটেলে সে রাত্রে আমিও ছিলুম। হয়ত তোমাদের খেয়াল ছিল না যে দরজাটা খোলা আছে, তোমাদের ঘরের দরজা খোলা, সিঁড়ির পাশেই ঘর, সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে গিয়েই আমার নজরে ঠেক্‌ল, তোমার তখন সময় কই আশেপাশে লক্ষ্য লক্ষ্য রাখ্‌বার। খুবই তখন তুমি ব্যস্ত…

জয়ন্তীর গাল লজ্জা ও ঘৃণায় আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল, দুহাতে সে মাথাটা চেপে ধর্‌ল, মাথায় অসহনীয় যন্ত্রণা, সে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। সত্যই হয়ত ডাক্তার তাদের দেখেছে, হয়ত দেখেছে টুটুলের বাহুবন্ধনে সে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, সেই রাত্রে ঐ হোটেলে ডাক্তারের আবির্ভাব এক অপূর্ব বিস্ময়! কি সম-সাদৃশ্য! কি নিদারুণ পরিহাস!

জয়ন্তী উত্তেজিত হয়ে বল্লঃ এ কথা আগে বল্লেই ত' পার্‌তেন, এতদিন গোপন রাখবার অর্থ?

ডাক্তার হাত উল্‌টিয়ে বল্লেন—বলিনি, এমনই কিছু বলিনি।

তারপর ডাক্তার একটা অদ্ভুত মুখভংগী করে বল্লেন: হট্টগোলের সৃষ্টি করে লাভ কি? তা ছাড়া ভাবলুম, মিসেস পাকড়াশীকে যদি সমস্ত ঘটনা জানাই, তাহ'লে হয়ত তোমাকে তিনি দিল্লী ছাড়া করবেন—তোমাকে আমার ভালো লাগে, তোমাকে ত' আর হারাতে চাই না।

এই লঘু পরিহাসের ভংগী ও একটা কুৎসিৎ ইঙ্গিত পূর্ণ বক্র কটাক্ষ জয়ন্তীর কানে ভালো লাগ্‌ল না। লোকটির প্রকৃতি কেমন ঠাণ্ডা ও মধুর ছিল, শয়তানি বুদ্ধি প্রভাবে হঠাৎ সেই লোকেরই কি বীভৎস আকৃতি হয়েছে। হঠাৎ রাগে, বা নীচতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হলে মানুষের কতখানি রূপান্তর ঘটে জয়ন্তী ভাবতে লাগ্‌ল. ডাক্তার যে এমন বিশ্রী ও বর্বর হয়ে উঠ্‌বে জয়ন্তী কখনও ভাবেনি. সে অত্যন্ত ঠাণ্ডাভাবে বলল: আপনি যদি মনে করে থাকেন যে আপনার এই কথাগুলিতে আমি কৌতূহলী হয়েছি তাহ'লে বল্‌ব আপনার ভুল হয়েছে—আপনার ওপর আমার এতটুকু মোহ নেই কোনোদিন হওয়া সম্ভবও নয়.—আর সেই রাত্রের কথা সম্বন্ধে এইটুকু বল্‌তে চাই পাকড়াশীর সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা হয়ত হয়েছিল. তাতেও কি খুব অপরাধ হয়েছে ?

—কিছু না, আলোচনায় আবার দোষ কি ? তবে একজন বিবাহিত লোকের গলা জড়িয়ে চুমো খাওয়া আর পবিত্র আলোচনায় অনেক-খানি প্রভেদ রয়েছে জয়ন্তী দেবী !

জয়ন্তী আবার চুপ করে রইল ক্ষণকাল। ডাক্তার তাহ'লে অনেক কিছুই দেখেছে, আশ্চর্য ! আজ সন্ধ্যায় সেদিনের কথা তোলার অর্থ, অনেকদিন ধরেই এই পরিকল্পনা ডাক্তারের মাথায় খেল্‌ছে. একটা কিছু জবাব দেবার জন্য জয়ন্তী মনে মনে চেষ্টা করল. লোকটির সঙ্গে ঠিক যে কি ভাবে কথা বলা উচিত জয়ন্তী ভেবে পায়না। অবশেষে সে বল্‌ল: আপনার মত লোকের পক্ষে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন না করাই কি বুদ্ধিমানের কাজ হত না ডাঃ মৈত্র ! এটা জান্‌বেন মিঃ পাকড়াশীর সঙ্গে আমার ঠিক যে কি সম্বন্ধ তা আপনি ঠিক বোঝেন নি, কি অবস্থায় যে সেদিনের ঘটনা ঘটেছিল তা আপনার জানা নেই, আপনি

সেদিনের কাহিনী প্রকাশ করে লাভবান হবে না, কারণ আপনি বুঝ্‌তে পারবেনও না!

—সেটুকু বোঝ্‌বার মত বুদ্ধি আমার আছে, বুঝেছি যে সেইরাত্রে আপনি আর মিঃ পাকৃড়াশী ঐ হোটেলে রাত্রিবাস করেছেন, আর সেই থেকে উভয়ে একত্রেই আছেন, একই বাড়িতে, একই ছাদের নীচে—কথাটা কি ভুল বলা হয়েছে?

রাগে, দুঃখে, অপমান জয়ন্তীর সারাদেহ জ্বলে গেল। ছিঃ ছিঃ লোকটা কি অসভ্য! সে তিক্ত কণ্ঠে বলল: আপনার মুখে একথা শোভা পায় না ডাঃ মিত্র! আপনি যা সঠিক জানেন না সে কথা আপনার প্রচার করা উচিত নয়, মিঃ পাকৃড়াশী সে রাতে ওখানে ছিলেন না। তিনি কিছুক্ষণ পরেই চলে যান, কি করে এই মিথ্যাটা আপনি এমন করে বল্লেন? আপনি অতি নোঙরা লোক দেখ্‌ছি।

ডাক্তার মৃদু হেসে তাচ্ছিল্য করে জয়ন্তীর পিঠে মৃদু আঘাত করে বল্লেন—অতটা উত্তেজিত হবেন না, আপনি খুকী ন'ন, সে রাতে আপ-নারা একত্রে ছিলেন কি ছিলেন না তাতে হয়ত সন্দেহ থাকৃতে পারে, কিন্তু আমি যে আপনাদের একত্রে ঐ ভাবে দেখেছি, সে কথা কি ভুল?

—ভুল হয়ত নয়, কিন্তু ডাঃ মৈত্র, আপনি ঠিক বুঝ্‌ছেন না, আমার গাড়িটা পথের মাঝে খারাপ হয়ে পড়ে, মিঃ পাকৃড়াশী আমাকে সাহায্য করেন, রাত তখন অনেক হয়েছে, ঝড় জলের আকাশ, কোথায় যাই, আমরা ঐ হোটেলে গিয়ে উঠেছিলুম। পরের দিন আমার 'মন্‌জিলে' আসার কথা, আর তার আগে মিঃ পাকৃড়াশীকে চিনতামও না।

এইবার সজোরে হেসে ডাঃ মৈত্র বল্লেন: তাহ'লে ত' ঘটনাটি আরো ঘোরালো, 'বিজড়িত জটিল রহস্যজালে'—'

তীক্ষ্ণকণ্ঠে জয়তী বল্ল : থামুন ! আমাকে আগে শেষ করতে দিন, দুজনেই আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম, খাবার টেবিলে কথা প্রসঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতা বেড়ে উঠল, দুজনেই দুজনের উপর আকৃষ্ট হয়েছিলাম, মিঃ পাকড়াশী কিন্তু ব্যাপারটা বেশিদূর গড়াতে দেন নি, তার আগেই তিনি গাড়ি নিয়ে পালিয়েছিলেন।

—বাঃ বেশ কাহিনীটি ! যাকে বলে "লভ্ এ্যাট্ ফাস্ট্ সাইট" প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেম,—তারপরই মিলন-বিচ্ছেদ ও বিরহ। বেশ, সুন্দর !" ডাক্তার শ্লেষের সঙ্গে বল্লেন।

অসহায়ের ভঙ্গীতে জয়তী বল্লে···আপনি কি কিছুতেই বোঝবার চেষ্টা করবেন না ? মিঃ পাকড়াশী ভালো কাজই করেছিলেন, তিনি একটি চিঠি লিখে রেখে চলে যান, পরদিন সকালে সে চিঠি আমি পাই। ভেবেছিলাম জীবনে আর হয়ত দেখাই হবে না। তারপর দিন "মন্‌জিলে" আসার আগে কিছুই বুঝিনি। পরে বুঝলাম ইনিই সানন্দাদিদির স্বামী। আপনার যদি এতটুকু মনুষ্যচরিত্রে জ্ঞান থাকে, তাহলেই বুঝবেন কি দুঃসহ জীবন আমার হয়ে উঠেছে।

শ্লেষ ও বিদ্রূপ মিশ্রিত কণ্ঠে ডাক্তার বল্লেন—আমার ত' অন্যরকম মনে হয়—পাকড়াশী আর তুমি এক বাড়িতে একত্রেই আছো, দুঃসহ জীবন বৈকি ? সানন্দার সন্দেহ মুক্ত হয়ে অকুতোভয়ে উভয়ে দিন কাটাচ্ছ, এর চেয়ে আর দুঃসহ কি হতে পারে ? সুযোগ কি কিছু কম মিল্‌ছে ? যাকে বলে সুবর্ণ সুযোগ !

জয়তী এতই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হ'ল যে ক্ষণকাল তার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা উচ্চারিত হ'ল না, অনেকক্ষণ পরে শীতল কণ্ঠে জয়তী বল্লে—আপনাকে যুক্তি দিয়ে বোঝানো অসম্ভব, তবে এই কথা বল্‌ব যদি আপনি ভদ্র এবং শিক্ষিত বলে নিজেকে মনে করে থাকেন

তাহলে সানন্দাদি'র কাছে একথা তুলে তাকে বিষিয়ে দেবেন না। তিনি স্ত্রীলোক, পাকড়াশীর স্ত্রী, হয়ত আপনার মতই দুই আর দুয়ে চার হিসাব করে বস্‌বেন—এটা জান্‌বেন পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু ঘটে যা আপনাদের কল্পনার বাইরে। এখন দয়া করে আমাকে একটু পৌঁছেদিন।

চিন্তাশীলের মত চিন্তিত ভঙ্গীতে ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে গম্ভীর ভাবে ধূমপাণ কর্‌ল, ডাক্তার বুঝ্‌ল যে তার ব্যবহারটা হয়ত ভদ্রোচিত হয়নি, তবু তার মনোভংগীর পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। ডাক্তারের মনে এতদিন যে-সন্দেহ বিচরণশীল ছিল আজ তা সুদৃঢ় হয়ে উঠ্‌ল, জয়তী ও পাকড়াশীর ভিতর যে একটা গোপন দৈহিক সম্পর্ক বর্তমান এ বিষয়ে ডাক্তার নিঃসন্দেহ। অথচ ডাক্তারের এই প্রেম নিবেদনে এত কঠিন ও কঠোর হয়ে ওঠার অর্থ সহজ বোধ নয়। জয়তীকে নিয়ে ভ্রমণে বেরোনোর প্রথম দিন থেকে ডাক্তার অনেকখানি ধৈর্য ও সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ ডাক্তারের জানা ছিল মেয়েটি একটু বাঁকাধরণের, সোজাসুজি প্রেম নিবেদনে বাধা আছে। এখন এই বিলম্বিত প্রক্রিয়ায় সুফল না হওয়ায় হতাশ ডাক্তারকে 'আনবিক অস্ত্র' নিক্ষেপ কর্‌তে হয়েছে। অবশেষে ডাক্তার বল্লেন: বাড়ি নিয়ে যাবার আগে ব্যাপারটি আরো একটু পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন। পাকড়াশীর উপর প্রেমটা গভীর হয়ে উঠেছে বলেই কি অধমকে এই উপেক্ষা ?

—আপনাকে ত' স্পষ্টই জানিয়েছি আমি তাঁকে ভালোবাসি।

—ব্যাপারটি যদি এতদূরই গড়িয়ে থাকে, তখন তাঁর স্ত্রীকে ঘটনাটি না জানানোর কোনো অর্থ হয় না, আর সে প্রতিশ্রুতি আমার দেওয়া উচিত নয়। তাঁর সব কথা জানাই উচিত, আমি তাঁর হিতৈষী বন্ধু।

—কথাটা একটু তলিয়ে দেখ্‌বেন, আমি যে পাকৃড়াশীকে ভালোবাসি সত্য। কিন্তু সে ভালোবাসার ভিতর উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, কলুষ নেই, তা ছাড়া পাকৃড়াশী ফেরবার আগেই আমি হয়ত চিরদিনের মতো এ দেশ ছেড়ে চলে যাব। সানন্দাদিকে সব কথা বলে তাঁর খুব বেশি উপকার করতে পারবেন না।

—তাহ'লে দেবী! তাই যদি হয়, অধমকে একবার সুযোগ দিয়ে দেখা উচিত, অতীতের কথা ভোলার তবু একটা সুযোগ মিলত। আমিই সাহায্য করতুম।

—ভুলতে যাতে পারি তার চেষ্টা আমি নিজেই করবো, সেখানে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হবে না ডাক্তার মৈত্র, এখন অনুগ্রহ করে এই অনুগ্রহ করুন, যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারি।

এই অনুরোধ উপেক্ষা করে ডাক্তার বল্লেন—তোমার এই "পাকড়াশী পর্ব" বিস্মৃত হ'বার জন্য যদি কারো সাহায্যের প্রয়োজন না থাকে, তাহ'লে কি বুঝবো পাকড়াশী পর্ব এখনও শেষ হয়নি?

—আমার কথাই যথেষ্ট, এর বেশি কিছু বলার নেই।

—আমার ওপর কিঞ্চিৎ সদয় হয়ে একটু প্রমাণ দিতেই বা ক্ষতি কি? একটা কঠিন উত্তর জয়তীর মুখে এসেছিল, কিন্তু ডাক্তারই পুনরায় সুরু করলেন: অর্থাৎ তুমি যদি আমার ওপর একটু সদয় হয়ে বন্ধু-ভাবে মেলামেশা করো—ডাক্তার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে জয়তীর মুখের দিকে তাকালেন—তাহ'লে বুঝ্‌বো পাকৃড়াশী পর্ব শেষ হয়েছে। আর তা যদি না হয়, তাহ'লে সন্দেহ হবে, যোগাযোগ নিবিড় এবং তখন সানন্দা দেবীর কানে তোলা ছাড়া আর আমার পথ নেই।

জয়তী বাণীহীন। এ এক জাতীয় ব্লাক্‌ মেইল—ভীতি প্রদর্শনের সন্ত্রাসকর নীতি। জয়তী কি উত্তর দেবে স্থির করার পূর্বেই ডাক্তার

মোটরের ইঞ্জিনের সুইচ্ টিপে 'মন্‌জিলে'র পথে গাড়ি চালিয়ে দিলেন।

অনেক পরে ডাক্তার বল্লেন—আশা করি শীগ্‌গীরই তোমার মনের কথা শুনতে পাব।

পরদিন প্রাতে সানন্দার ঘরে প্রবেশের সময় জয়ন্তী মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করল যে এই সপ্তাহের ভিতরেই সে "মন্‌জিল" ছাড়বে, এ কথা জানিয়ে দেবে।

গত রজনীর ঘটনা বিষাক্ত ক্ষতের মতো জয়ন্তীর চিত্তে দাহ সৃষ্টি করেছিল। ডাঃ মৈত্র যে হোটেলের ঘটনার উল্লেখ করেছেন তার জন্য জয়ন্তী খুব বেশি ক্ষুন্ন হয়নি, ডাক্তারের কদর্য ব্যবহার তার অন্তরে বিদ্রোহ সুরু হয়েছে। যার এমন মনোহর রূপ, মনোরম ভংগী, ভদ্র ও ভব্য ব্যবহার তার চরিত্রের অপর অংশে যে এতখানি কালি ও কলুষ বর্তমান, এই আকস্মিক আবিষ্কারই জয়ন্তীর অন্তরে রূঢ় আঘাত করেছে।

"মন্‌জিলে" ফেরার পর সারারাত জয়ন্তীর কানে ডাক্তারের শ্লেষোক্তি অনুরণিত হয়েছে; আর এখানে জয়ন্তীর থাকা চলে না, প্রতিহিংসা পরায়ণ ডাক্তার যে কোনো মুহূর্তে সানন্দার কাছে সকল কথা প্রকাশ করবে, আর সানন্দা এক তরফের কাহিনী শুনে তার ওপর রঙ ফলাবে, যতই হোক্ সানন্দা স্ত্রীলোক, স্বামীর চরিত্রের ওপর এতটুকু কলঙ্কস্পর্শ করলে তার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হবেই, সানন্দার নিজের চরিত্র যদিও কলঙ্কমুক্ত নয় তবু হয়ত সানন্দা এই ঘটনা ক্ষমাসুন্দর চক্ষে, সহজে ও সরলভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। কারণ সানন্দা নারী। এই অস্বস্তিকর অবস্থার সন্মুখীন হতে জয়ন্তী অক্ষম, তার আগেই এ পুরী পরিত্যাগ করা সকল দিক দিয়েই মঙ্গলকর হবে। আর সেই ত'

তাকে যেতেই হবে, দুদিন আগে আর পরে। টুটুল যে কবে ফিরবে তার কিছু ঠিক নেই, টুটুল কল্‌কাতায় গিয়েছে অনেক দিন। এ সময়ে জয়ন্তীকে সানন্দারও আর তেমন প্রয়োজন নেই।

"ক্লাচেস"-এ ভর দিয়ে, কখনো দেয়াল ধরে বা কারো কাঁধের ওপর হাত রেখে সানন্দা উঠে বেড়ায়, ডাক্তার বলেছিল শীগ্‌গীরই বিনা "ক্লাচেসে" ঘোরাফেরা করতে পারবে। হয়ত আর এক সপ্তাহ লাগ্‌বে। প্রতিদিন কত অতিথি আসে, সানন্দার শারিরীক কুশল প্রশংসার জন্য তাঁদের আর উদ্বেগের সীমা নেই। বাড়িতে আবার আনন্দের স্রোত বইছে, "মন্‌জিল" আবার ক্রমশঃই কোলাহল মুখর হয়ে উঠ্‌ছে।

এদিকে জুলাই মাস শেষ হয়ে এল, ১৪ই জুলাই ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা জাতির ইতিহাসে একটা যুগান্তরের সূচনা করবে। ভারতের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকার দাবি—বৃটিশ শক্তির অপসারণ ও সাময়িক সরকার গঠনের প্রস্তাব—সম্মিলিত জাতিগণের সঙ্গে পররাষ্ট্র আক্রমণ প্রতিরোধের সংকল্প এবং এই আবেদন ব্যর্থ হলে যে বৈপ্লবিক আন্দোলন সুরু হবে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ৪ঠা আগস্ট আবার কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বস্‌বে এইবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সুতরাং এই সপ্তাহের মধ্যেই 'মন্‌জিল' ছাড়তেই হবে। দিল্লী শহর থেকে পদ্মাবতী দেবী জয়ন্তীকে আহ্বান জানিয়েছেন,—এখন থেকেই আসন্ন আন্দোলনের প্রস্তুতির প্রয়োজন।

সানন্দা বিছানার ওপর বসেছিল, জয়ন্তী দেখল সানন্দা চিঠি পড়্‌ছে, আশেপাশে কয়েকটি চিঠি ছড়ানো। যথারীতি বিছানার

প্রান্তে বস্‌বার সময় জয়তী লক্ষ্য করল—টুটুলের স্বাক্ষরাঙ্কিত খাম পড়ে আছে, টুটুল তাহলে চিঠি দিয়েছে। জয়তীর মনে হল এই চিঠিটা আগে পড়বার জন্য সানন্দাকে অনুরোধ করে। সানন্দা কিন্তু তার স্বভাব সিদ্ধ অলস মন্থর গতিতে অন্য চিঠি পড়্‌তে লাগল! চিঠিগুলির যে সব অংশ জয়তীর শোনা উচিত, সেই সব অংশ পড়ে শোনানো হ'ল, তারপর সেই পত্রলেখক বা লেখিকার সম্পর্কিত কোনো বিশেষ ঘটনার অতীত কথা রোমন্থিত হ'ল। তারপর সেই চিঠি ছেড়ে অপর চিঠি ধরা হ'ল, এইভাবেই সানন্দা সকালবেলা মশগুল্ হয়ে থাকে।

অবশেষে টুটুলের চিঠি খোলা হ'ল, সানন্দা রহস্য করে বলে উঠ্‌ল, বাবু সাহেবের চিঠি, দেখা যাক্ কি হুকুম!

সানন্দা নীরবে সমস্ত চিঠিটা পড়্‌ল, তাও কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্য ভরে। তার কাছে যেন চিঠিটার মূল্য নেই এতটুকু। তারপর পঠিত চিঠি পুনরায় উন্মুক্ত খামে ভর্‌বার সময় জয়তীকে বল্‌ল "কল্‌কাতায় বেশ আনন্দে আছে, এতদিন বালীগঞ্জে ছিলেন, এখন নাকি খড়দায় গঙ্গার ধারের আমাদের বাগান বাড়িতে উঠে এসেছেন, তা গঙ্গার ধার আমার মন্দ লাগে না, তবে যত কল কারখানার নোঙরা ধুলো আর বালি বিশ্রী লাগে।

সানন্দার দৃষ্টিপথ থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে আনত মুখে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে জয়তী বল্লে—কবে আস্‌ছেন কিছু লিখেছেন নাকি?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, এক জায়গায় লিখেছেন, বুধবার নাগাৎ আসছেন, তুফান মেলেই আস্‌বে বোধ হয়।

জয়তী চুপ করে রইল, কিন্তু তার হৃদ-স্পন্দনের গতিবেগ যেন দ্রুততর হয়ে উঠ্‌ল, এমনই হয়, যখনই টুটুলের কথা বা নমোচ্চারিত হয়। টুটুল তাহলে ফির্‌ছে শীগ্‌গীর, তাহলে ত' এখান থেকে অবিলম্বে

সরতে হয়। প্রথমতঃ বল্‌তে হবে অন্যত্র তাকে যেতেই হবে বিশেষ প্রয়োজন, কিংবা একটা চাকরির কথা তুল্‌তে হবে। মিথ্যা বলা ছাড়া উপায় নাই, কারণ সত্য কথায় অনেক বাধা, সত্য বলার পথ বন্ধ।

বহুদিন আগে এই খড়দার বাগানে কি মজার কাণ্ড ঘটেছিল সেই বিষয় সানন্দা চটুলভাবে রসাল গল্প সুরু করে দিল। জয়ন্তী অন্য-মনস্কভাবে শুনতে লাগল। টুটুলের প্রত্যাশিত প্রত্যাগমনের সংবাদের মুখেই হঠাৎ তার চলে যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করা সমীচীন হবে না, তাহ'লেই হয়ত সানন্দা সোজা হিসাবে দুই আর দুয়ের যোগফল চার করে বস্‌বে।

ক্রমশঃ আলোচনাটি কৌশলে সানন্দার পায়ে এনে ফেলা গেল, অর্থাৎ শ্রীচরণ-প্রসঙ্গে আনা গেল। জয়ন্তী বল্লে—শুনেছি শীগ্‌গীরই নাকি বিনা ক্রাচেস্‌-এ তুমি বেড়াতে পারবে। তোমার কি মনে হয়?

—হ্যাঁ, ডাক্তার তোকে কিছু বলেছে নাকি? এই সপ্তাহেই হয়ত পারব, রোজ একটু করে অভ্যাস কর্‌তে মৈত্র বলেছে। খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠেছি, কি ব'লিস? দুটো কাঠ বগলে করে খোঁড়ার মত ঘোরাঘুরি করা কেমন যেন বিশ্রী লাগে।

জয়ন্তী কি উত্তর দেবে চিন্তা কর্‌তে লাগ্‌ল। তারপর বল্‌ল—দিদি, তুমি একটু সাম্‌লে উঠ্‌ছ ত, এইবার আমার বিদায় নেবার পালা।

সানন্দা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকাল। তারপর কঠোর ভঙ্গীতে বল্‌ল: আবার এইসব আরম্ভ হ'ল।

—কেন দিদি, আগেই ত' ঠিক হয়েছিল, তুমি একটু সেরে উঠ্‌লেই আমি পালাব, তুমিও ত' রাজী ছিলে!

—আমি ভেবেছিলাম এতদিনে তোর হয়ত একটু সুমতি হয়েছে। হয়ত আর এখন যেতে চাইবি না।

আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে জয়তী সানন্দার মুখের দিকে তাকাল, বল্ল: না গেলেই হয়ত ভালো হ'ত, কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, যাওয়ার দরকার বড় বেশি হয়ে উঠেছে।

—যত সব আজগুবি কথা, কি এমন দরকার শুনি? কিছুই কারণ নেই।

মাথার রুক্ষ চুলগুলি সন্তর্পণে গুছিয়ে নিয়ে জয়তী বল্ল:—আমার পথ ত' বেছে নিতে হবে দিদি!

সানন্দা এতক্ষণে সত্যই বিস্মিত হ'ল, জয়তী বলে কি! তারপর বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে শুস্ককণ্ঠে বলল: ভালো না লাগ্‌লে তুমি যাবে বৈকি, কিন্তু কেন যে ভালো লাগ্‌ছে না বুঝ্‌ছি না।

জয়তীর গলা ধরে গেছে, কণ্ঠস্বর স্পষ্টভাবে উচ্চারিত নয়, সে অতি কষ্টে বল্‌ল···ভালো লাগে, কিন্তু শহরে একটা জরুরী কাজ আছে, সেইখানেই দিনকতক থাকতে হবে, মানে একটা চা ক রী পেয়েছি।

এক নম্বর মিথ্যা কথা, জয়তীর এই কথা উচ্চারণ করেই কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। এখানে মিথ্যা বলা ছাড়া আর কি উপায় আছে!

সানন্দা জোরে নিশ্বাস ত্যাগ করে বল্‌ল···তাই নাকি! চাকরী? কি ধরণের চাকরী? অনেক টাকা মাইনে দেবে? তা এখানে থেকেও ত' যাতায়াত করতে পারিস, আর চাকরীরই বা কি প্রয়োজন, আমিও ত' তোকে একটা এলাওয়েন্স্ বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

—শুধু টাকার কথাটাই বড় নয়, একটা স্বাধীনভাবে কিছু করবার সুযোগ পাব, হয়ত আমার ভালো লাগবে।

—কি ধরণের চাকরী ? মাস্টারী না মেয়ে কেরাণী ?

—সেক্রেটারীর কাজ, অফিসেরই কাজ—

—কার সেক্রেটারী ? নাম কি তাঁর ? এখানকার সবাইকেই আমরা জানি।

জয়তী যা হয় একটার নাম বলার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুই মুখে এল না, বল্ল ঃ কি যেন নামটা, সহজে মনে আস্‌ছে না। তবে নামেরই বা কি প্রয়োজন, আমি স্থির করেছি এবার আমি যাবই।

সানন্দা উত্তেজিত হ'ল, এতক্ষণে তার বিরক্তি বিরাগে পরিণত হয়েছে, বল্ল ঃ একটা কথা বুঝছি না, তোর হঠাৎ চাকরীর কি এমন দরকার পড়্‌ল, আমি হয়ত একটু বেশি জ্বালাতন করি, সে নেহাৎ ভালোবাসি তাই। বলিস যদি তোকে আর না হয় খাটাবো না, ভালো কথা ডাঃ মৈত্রের খবর কি ? ভেবেছিলাম তোদের দুজনের বেশ মনের মিল হয়েছে হয়ত সেই কারণেই অন্ততঃ তুই আরো কিছুদিন থেকে যাবি। ডাক্তারকে ত' তোর পছন্দ হয় ?

জয়তী একটু ইতঃস্ততঃ করল ঠিক এই মুহূর্তে এই ডাক্তারের মতো আর কাউকে জয়তী ঘৃণা করে না, আর কোনো ব্যক্তি তার শত্রু নয়, কিন্তু সানন্দার কাছে ত' সে কথা বলা চলে না, তাই একটু ঘুরিয়ে উত্তর দিল ঃ—ডাক্তারই হোক্ আর যেই হোক্, কারো জন্যে ত' আর কাজের ক্ষতি করতে পার্‌বো না।

—ননসেন্স্, —তোদের মধ্যে যদি সত্যিকার প্রেম থাকৃত, তাহলে আর অন্য কোথায় চাকরী নিয়ে পালাবার চেষ্টা করতিস না, অবশ্য দিল্লীর শহরেই হয়ত থাকৃবি। তবু যেন একটা লুকোচুরীর ভাব লক্ষ্য করছি ?—সানন্দা তার এই সম্পর্কিত বোন্‌টির নির্বোধ অবাধ্যতায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে; সেই উষ্মা আর চাপা গেল না।

এবার জয়ন্তীর রাগের পালা, ডাক্তারের সঙ্গে দু একদিন সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছে সুতরাং উভয়ের মধ্যে প্রেম সঞ্চারিত হয়েছে, এই ধারণা করার কোনো হেতুই সানন্দার নেই। সানন্দা প্রেমের কি জানে? প্রেম কাকে বলে? ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্টের পরিমাণ যার কাছে প্রেমের পরিমাপ, সেও প্রেমের কথা নিয়ে ব্যঙ্গ করে, জয়ন্তী স্পষ্টই বলে ফেল্‌ল: তুমি একটু ভুল ধারণা করেছ, ডাক্তারের ওপর আমার এতটুকু মোহ নেই, কোনো দিন হবেও না, কেন যে হবে তারও কোনো কারণ দেখি না।

সানন্দা শ্লেষের ভঙ্গীতে বল্লে—কিন্তু জয়া তাহ'লে কি বুঝব এত-দিন নিছক নিরামিষ প্রেমাভিনয় হ'ল, তুই যদি একটু সদয় না হয়ে থাকিস তাহলে ওই বা এত ঘোরাঘুরি করে কেন?

—সে কারণ আমার সঠিক জানা নেই, তবে এইটুকু জেনে রাখ দিদি, ওঁকে আমি মোটেই ভালোবাসি না। আর আমার জীবনে ওঁর প্রভাব কোনোদিনই স্পর্শ করবে না।

সানন্দা এইবার একটু নরম হয়ে, নিজের জন্য, ডাক্তারের জন্য 'মন্‌জিলে'র জন্য ওকালতী করল। জয়ন্তীর বিরহে সানন্দা সত্যই বিব্রত হয়ে পড়্‌বে, সানন্দার সমস্ত সংসারে জয়ন্তী একটা শান্তি ও ও শৃঙ্খলা এনেছে, তার সাহায্য অপরিহার্য, জয়ন্তীর 'মন্‌জিলে' আবির্ভাবের পর সানন্দাকে একদিনও কোনো কিছু করতে হয়নি, হাতে মিলেছে অখণ্ড অবসর। আর এমনই ঠাণ্ডা মেয়ে জয়ন্তী। এতদিনেও তার প্রয়োজনীতা ও উপস্থিতির গুরুত্ব সে নিজেই হয়ত বোঝেনি, ব্যবহারে ও বাক্যে এতটুকু প্রকাশ নেই। সানন্দার তাই ভালো লাগে। জয়ন্তীর উপস্থিতি এ সংসারে তাই সার্থক হয়েছে। এর সঙ্গে ইদানীং যুক্ত হয়েছিল, ডাক্তার মৈত্রের

নিয়মিত আগমন ও প্রেম নিবেদন। সানন্দা সত্যই ভেবেছিল জয়তীকে 'মন্‌জিলে' আট্‌কাবার জন্য ডাক্তারই মস্ত একটা আকর্ষণ।

সানন্দার মনোভাব জয়তী বুঝ্‌ল। আর সেই কারণেই তার মনোভংগী অধিকতর তিক্ত হয়ে উঠ্‌ল। সানন্দার দৃষ্টিভংগী কি ক্ষুদ্র! কত নীচ! নিজের জীবনের প্রয়োজনটুকু মিট্‌লেই হ'ল, অপরের কি প্রয়োজন হতে পারে সে কথা সানন্দার ভাব্‌বার দরকার নেই। ওপরের তলায় সব কিছু যতক্ষণ ঠিক থাক্‌বে ততকাল আর গভীরে নাম্‌বার প্রয়োজন কি? এই-ই সানন্দার স্বার্থপরতা—এই তার "ego" বা অহং, আর এর ফলেই টুটুল আর সানন্দার বিবাহিত জীবন বিষময় হয়ে উঠেছে।

সানন্দা তর্ক কর্‌ল, যুক্তি দিল, অনুনয় জানালো। বোঝালো জয়তী চলে গেলে এ সংসারে কত অসুবিধা হবে, করুণ কণ্ঠে বল্‌ল—'মন্‌-জিলে'র সব দায়িত্ব ঘাড়ে করে নেবার মত সামর্থ্য এখনও তার হয়নি।

জয়তী কিন্তু অটল। জানালো আর দু চার দিন সে থাকতে পারে, আর সানন্দা যদি রাজী হয় তাহলে না হয় কাউকে সংগ্রহ করে এনে দেবে সংসারের কাজকর্ম দেখার জন্য।

সহসা কি ভেবে সানন্দা বল্‌ল—আচ্ছা, একটা কথা সত্যি বল্‌বি, তোর জামাইবাবুর জন্যেই কি তুই পালাচ্ছিস্? হয়ত তার ব্যবহার, কিংবা কোনো কিছু মন্তব্য তোকে আঘাত দিয়েছে? যদি কিছু বলেই থাকে জান্‌বি তা এমনই বলেছে হয়ত, এদিকে উনি লোক ভালো কাউকে রূঢ় কথা বলা ওঁর স্বভাব বিরুদ্ধ।...

জয়তীর মুখখানি প্রথমে রক্তিম পরে সম্পূর্ণ শাদা হয়ে গেল—সে প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়ে বল্‌ল:—না—না, তা কেন, উনি কোন দিন আমাকে কিছু বলেন নি!

সানন্দা তিক্তকণ্ঠে বল্‌ল—তাহ'লে তাঁর সঙ্গে দেখা না করে তোমার যাওয়া হতেই পারে না, হয়ত তিনি উল্টা বুঝ্‌বেন, ঠিক ফেরবার মুখেই এই ব্যাপারটি হয়ত তাঁর চোখে ভালো ঠেকৃবে না।

তারপর বিষয়টি আরো জটিলতর করে সানন্দা বলে উঠ্‌ল, ডাক্তারকে যদি পছন্দ না হয় ওঁর সঙ্গে বেরোলেই পারিস, 'এ কথার অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বর্তমান জয়ন্তী তা বোঝে। জয়ন্তীর মুখখানি এমনই করুণ ও রক্তিম হয়ে উঠ্‌ল যা সহজেই নজরে পড়ে। জয়ন্তী তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলে গেল। এই ব্যাপারে সানন্দার চিন্তাধারার একটি নতুন দিক উন্মোচিত হল, সানন্দা নির্বোধ নয়, সহসা তার চোখে সব যেন স্পষ্ট হয়ে এল, সে ভাবল ঃ

"কি ভয়ানক! জয়ার এত বুদ্ধি! হয়ত ভেতরে ভেতরে ওকেই ভালোবেসে বসে আছে, স্কুল কলেজের মেয়েদের মন রোমান্সের ফানুষ, তাই পালাতে চায়, আমি তাহ'লে ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছি। ছিঃ ছিঃ—কি লজ্জার কথা!"

এই অনুকম্পা ও করুণার পর সানন্দার আর একটি খেয়াল হ'ল। জয়ন্তীকে পাকড়াশীই বা কি চোখে দেখে, সানন্দা ত' নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, কোনো দিকে চোখ নেই, ওদিকে হয়ত চোর যথাসর্বস্ব নিয়ে পালাবার উদ্যোগ করছে। তবে কোনোদিনই জয়ন্তী সম্পর্কে রঞ্জিতের আগ্রহ লক্ষিত হয়নি। এদিকে জয়ন্তী মেয়েটি সাদাসিধে ও ঠাণ্ডা প্রকৃতির। চমক লাগাবার মতো কোনো কিছুই ত' জয়ন্তীর নেই, দেখ্‌তে হয়ত ভালো, তবে ঐ পর্যন্তই, এ ধরণের বোকা টাইপের মেয়ে রঞ্জিতের কাছে কিছুই নয়। সানন্দা মনে মনে এই সব কথা ভাব্‌তে লাগল···ঠিক করল, রঞ্জিৎ ফির্‌লেই বল্‌তে হবে যে সে এক শীকার গেঁথে বসে আছে। হয়ত রঞ্জিৎ একটু অনুগ্রহ দেখালে জয়ন্তী কয়েক-

দিন থেকে যেতেও পারে। জয়তীর ওপর সানন্দার কোনো রাগ নেই, জয়তী প্রফুল্ল থাকুক, জয়তীর মর্মবেদনা দূর হোক্, এই সানন্দার কামনা।

সানন্দার সঙ্গে জয়তীর আলোচনা যে সহজে মিটেছে এর জন্য জয়তী নিজের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিল। সানন্দার সঙ্গে তর্কে পারা কঠিন, আর জয়তীর 'মন্‌জিল' ছাড়ার কোনো হেতু নেই এই ধারণাই সানন্দার মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে।

সানন্দার সঙ্গে কথায় জয়ী হতে হলে দৃঢ় হয়ে নিজের মত আঁকড়ে থাকতে হবে—সানন্দা নিজের অসহায়ত্বের কথা তুলে অপরের সহানুভূতি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে, এটা তার একটা অভিনয় মাত্র, প্রকৃতপক্ষে কোনো রকম সহানুভূতি পাবার অধিকার তার নেই।

রঞ্জিৎ সম্পর্কে সানন্দার সর্বশেষ উক্তি জয়তীর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। যাই হোক্ সানন্দা রঞ্জিতের সঙ্গে জয়তীর একটা সংযোগ কল্পনা করেছে, আর যে কোনো কারণেই হোক্ রঞ্জিৎ না আসা পর্যন্ত 'মন্‌জিলে' তাকে আট্‌কে রাখবার সিদ্ধান্ত করেছে—কিন্তু সৌভাগ্যের কথা বল্‌তে হবে সানন্দার মনে হয়েছে, রঞ্জিৎ হয়ত জয়তীর সঙ্গে কোনো রূঢ় ব্যবহার করেছে। সানন্দা এখনও প্রকৃত তথ্য থেকে অনেক—অনেক দূরে রয়েছে! জয়তী ভাব্‌ল, তবু ভালো সানন্দা রঞ্জিতের সঙ্গে জয়তীর যে-সংযোগ বর্তমান তা কল্পনা কর্‌তে পারেনি।

সানন্দাকে যে 'মন্‌জিল' ছেড়ে যাবার প্রযোজন বোঝাতে পেরেছে এই কথা ভেবে জয়তী নিজেকে ভারমুক্ত মনে কর্‌ল, রঞ্জিৎ ফেরবার আগেই জয়তী পালাবে। টুটুলকে চোখে না দেখে চলে যাওয়া কষ্টকর তবু একবার কিছুক্ষণের জন্যে দেখে তারপর যাওয়া আরো কষ্টকর।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, দিল্লার সন্ধ্যা, সূর্যাস্ত হবার অনেক পরেও আকাশে আলো থাকে, জয়তী বৈকালিক স্নান সেরে তার অনাড়ম্বর প্রসাধনে সান্ধ্য সজ্জা শেষ করল। এইবার একটু বাগানে পায়েচারী করবে, তারপর আবার সানন্দার পাশে গিয়ে অবান্তর গল্প করতে হবে। জয়তীর হাতে মালি এসে কতকগুলি টাট্‌কা তোলা লাল গোলাপ দিয়ে গেল—এমন সময় বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল, অপরিচিত আওয়াজ, হয়ত কমরেড চৌধুরী। লোকটীকে সঠিকভাবে জানার জন্য, জয়তী এগিয়ে এল। লোকটী কিন্তু চৌধুরী নয়, এ চেহারা সহস্র লোকের জনতার ভিতরেও জয়তী চিনে নেবে। তার অধরে অশান্ত ঝড় সুরু হ'ল, এ যে টুটুল! কিন্তু তাই বা কি করে হবে? আরো এক সপ্তাহ বাকী যে তাঁর আসতে।

ট্যাক্সি এগিয়ে এল, সকল সন্দেহ মিলিয়ে গেল, গাড়ি থেকে নাম্‌ল রঞ্জিৎ পাকড়াশী। ট্রেণ থেকে সোজা নেমে এসেছে, একটু ম্লান দেখাচ্ছে, পরণে বিদেশী পোষাক।

মাথার টুপী খুলে রঞ্জিৎ হলঘরের সামনের সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এল, জয়তীকে সাম্‌নে দেখেই পুলকভরে বল্‌ল···জয়া, তোমাকে যে আবার এখানে দেখ্‌ব ভাব্‌তে পারিনি, ভেবেছিলাম যদি সম্ভব হয় শহরে গিয়ে একবার লুকিয়ে দেখা করে আসব।

জয়তী ধরা গলায় বল্‌ল···টুটুল···কি করছিলে এতদিন? মানে এত শীগ্‌গীর এলে কি করে?

টুটুল বিস্ময়াহত দৃষ্টিতে জয়তীর মুখপানে তাকিয়ে রইল, এ আবার কি প্রশ্ন? বল্‌ল···কেন সানন্দা আমার চিঠি পায়নি?

—হ্যাঁ, সে চিঠিতে লেখা আছে, আসছে বুধবার ফেরার সম্ভাবনা।

—আসছে বুধবার! পোড়া কপাল! গত সপ্তাহে লিখেছিলাম

আস্‌ছে বুধবার অর্থাৎ আজ-ই ফিরব। সে চিঠি নিশ্চয়ই নন্দা পেয়েছে, আজ স্টেশনে গাড়ি পাঠান হয়নি কি সেই জন্য ?

জয়ন্তীর কাছে বিষয়টি এতক্ষণে পরিষ্কার হ'ল। সে বল্‌ল : —বুঝেছি, কি হয়েছে, তোমার চিঠি আজ সকালে এসে পৌঁছেচে, সানন্দা যখন পড়্‌ল "আস্‌ছে বুধবার দিল্লী ফিরব", তখন সে আর আর আমি দুজনেই ধরে নিয়েছি সাম্‌নের বুধবার, চিঠি লেখার তারিখ কেউ লক্ষ্য করেনি।

টুটুল হাস্‌ল। বল্‌ল···আমারই বোকামী! আমার উচিৎ ছিল তারিখ দেওয়া। যাই হোক্‌, এখন আহার জুটবে ত'? যে দিনকাল—'

জয়ন্তী সপ্রতিভ ভঙ্গীতে বল্‌ল···বা রে, তার মানে ?

টুটুল সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে বল্‌ল···নন্দা কেমন আছে এখন ?

—ভালোই আছে, শীগ্‌গীরই শুনছি 'ক্রাচেস্‌' ছেড়ে চল্‌তে পারবে।

—ভালো কথা।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব, তারপর টুটুল মৃদুকণ্ঠে বল্‌ল : তোমাকে আবার পেয়ে বড় আনন্দ হ'ল জয়া, আমার কেবলই মনে হয়েছে, তুমি বোধহয় পালিয়েছ।

টুটুলের সান্নিধ্যে জয়ন্তীর ভাবাবেগ প্রবল হয়ে উঠেছে, তার উপস্থিতি ও স্পর্শ জয়ন্তীকে আকুল করে তুলেছে—তবু জয়ন্তী নিজেকে সংযত রেখেছে, এই ঢেউয়ের মুখে নিজেকে শক্ত রাখতে হবে। সে ধীরে ধীরে বল্‌ল···টুটুল আমি কিন্তু শীগ্‌গীরই যাচ্ছি, জুলাই শেষ হতে চল্‌ল, আগস্টের গোড়াতে বোম্বায়ে আবার কংগ্রেসের মিটিং বস্‌বে,

নতুন আন্দোলন শুরু হবার আগেই আমাকে পুরানো দিল্লীতে চলে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে হয়ত আর কখনও দেখাই হবে না।

—তোমার কি এই মতলব না কি?

—আমার কি মত ও পথ তা তোমাকে জানিয়েছি, কিন্তু আমি কি করতে চাই সেটাই বড় কথা নয়, আমার এখনই কি করা উচিত সেইটাই সর্বপ্রধান কথা। তুমি যাবার আগেই বলেছি, তোমার সঙ্গে একই বাড়িতে দিন কাটানো আমার উচিত নয়, চলবেও না।

—আমাকে এখনও ভয়?

—হ্যাঁ, ভয় নয়, সংকটের শঙ্কা! আর তা ছাড়া সেই ত' আমাকে যেতেই হবে।

—তোমাকে বাধা দেবার শক্তি আমার নেই জয়া, আমার বাসনা যাই হোক্‌, ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আমি দীর্ঘ দিন তোমাদের ছেড়ে আছি, কিন্তু তোমার কথা ভেবেছি প্রত্যহ। কবির কথায়—

নিত্য তোমায় চিত্ত-ভরিয়া স্মরণ করি,

টুটুল জয়তীর হাত থেকে দুটো গোলাপ নিয়ে তার খোঁপার ভিতর সাজিয়ে দিল।

জয়তীর ডাগর চোখ দুটি জলে ভরে গেল। অতি কষ্টে জয়তীর কণ্ঠে উচ্চারিত হল···টু টু ল।

উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে ক্ষণকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এই সাক্ষাৎকারে উভয়েই পরিতৃপ্ত, আর আসন্ন বিরহের সম্ভাবনায় উভয়েই বিচ্ছেদকাতর। দুজনের অন্তরে গভীর প্রেমাবেগ প্রবহমান।

জয়তী এইবার বল্‌ল···তাড়াতাড়ি যাবার আর একটা মস্ত কারণ রয়েছে টুটুল—'

সচকিত রঞ্জিৎ প্রশ্ন করল…কারণটি কি ?

জয়ন্তী সংক্ষেপে ডাক্তার সংক্রান্ত কাহিনীটি টুটুলকে শোনালো, বল্লো নিছক সৌজন্যের খাতিরেই সে ডাক্তারের সঙ্গে মিশেছিল। টুটুল নীরবে সমস্ত শুনল, তারপর জয়ন্তী যেই বলল এই প্রেম নিবেদনে সাড়া না দিলে সানন্দাকে ডাক্তার সেই কোসী কালানের হোটেলের কথা জানাবে বলেছে তখন টুটুল ক্রোধে জ্বলে উঠে বলল—বলো কি জয়া ! ডাক্তার এই কথা বলেছে ? লোকটা এতদূর বর্বর কোনোদিন ভাবিনি।

জয়ন্তী বলল…আমারও ত' ভালো ধারণাই ছিল। এখন তাই ভাব্ছি এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়াই ভালো।

—আমি ডাক্তারকে ধরবো, সোজাসুজি ওকে প্রশ্ন করব!

জয়ন্তী অনুরোধ জানিয়ে বলল…না না তা কোরোনা, তাতে হয়ত ফল ভালো হবে না, ও যদি একটা হট্টগোল করবেই স্থির করে থাকে, তাহ'লে আমাদের উচিত দিদির কাছে সত্য ঘটনাটা বলা, দিদি নিশ্চয়ই ভুল বুঝ্বেনা।

টুটুল বলল…আশ্চর্য ভাগ্য সেই রাতেই ডাক্তারটাও ওখানে গিয়ে জুটল, তবে প্রয়োজন হলে একথা প্রমাণ করা শক্ত হবে না, সে রাতে আমি ওখানে ছিলাম না।

ভালোর দিক ভেবে জয়ন্তী বলল…হয়ত ডাক্তার কিছুই জানাবে না আমার ওপর চটেই রাগের মাথায় ঐ সব বলেছে, ভালো করে সমস্ত বিষয়টি তলিয়ে বুঝ্লে দেখ্বে, মিথ্যা প্রত্যাশার মোহে উনি আগাগোড়াই ভুল করে বসেছেন, তখন হয়ত উনিই আমার কাছে ক্ষমা চাইবেন।

টুটুল বলল—ভালো হলেই ভালো, অন্ততঃ সেই আশাই করা উচিত ? এখন আর ও কথা নিয়ে মন খারাপ করে লাভ কি ?

জয়ন্তীর হাত ধরে টুটুল তাকে ভিতরে নিয়ে গেল।

ওপরের বারন্দা থেকে সমস্ত ঘটনাটি সানন্দা নীরবে লক্ষ্য করছিল। মোটরের আওয়াজ পেয়ে অতিথিটিকে দেখ্‌বার কৌতুহলে সে বারান্দায় উঠে এসেছিল—রঞ্জিৎকে এ সময় ফির্‌তে দেখে সানন্দা চমকিত হয়েছিল কিন্তু প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাট্‌বার পর হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল জয়ন্তী কি ভাবে টুটুলকে বরণ করে দেখা যাক্‌, সানন্দার সকালের সন্দেহ সন্ধ্যায় সত্যে পরিণত হবে সে আশা ছিল না,

কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবা যায়নি যে রঞ্জিৎ স্বয়ং নিজেকে হারিয়ে বস্‌বে, বিশেষতঃ জয়ন্তীর মত একটা সামান্য মেয়ের কাছে। সানন্দার ধারণা ছিল একা জয়ন্তীই আজকালকার কলেজের মেয়ের মত হয়ত মনে মনে রঞ্জিৎকে অন্তরে মেনে নিয়েছে—কিন্তু রঞ্জিৎ যে এই তুচ্ছ ব্যাপারে জড়িত আছে সে কথা সানন্দা কোনোদিন কল্পনা করেনি।

তাই যখন দেখ্‌ল, রঞ্জিৎ গাড়ি থেকে নেমেই জয়ন্তীকে দেখে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে ওপরে উঠে এল, তারপর যে-অন্তরঙ্গতায় জয়ন্তীর হাতদুটি নিজের হাতের ভিতর গ্রহণ করল তখন সানন্দা অন্তরে সর্বপ্রথম আঘাত পেল, তার সকল ধারণা এই এক আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল।

কি যে ওদের কথা হ'ল সানন্দা অবশ্য শুন্‌তে পেল না, শুন্‌লো না ওদের প্রেম সম্ভাষণ, তবে মৌখিক ভঙ্গিমায় অন্তরের যে রূপ মূর্ত হয়ে উঠ্‌ল, সানন্দার চোখে তার অন্তর্নিহিত অর্থ পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ল।

সানন্দা এই সর্বপ্রথম বুঝ্‌ল ব্যাপরটি তার অবস্থার চাইতে অনেক দূরে চলে গেছে, শুধু যে জয়ন্তীর তরফ থেকে একটা মোহের অভিব্যক্তি তা নয়, জয়ন্তী ও রঞ্জিৎ গভীরভাবে পরস্পর আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। যে

সব বিষয় এতকাল সানন্দার কাছে অবোধ্য হেঁয়ালির মত ছিল সহসা যেন সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। সানন্দা আর দাঁড়াতে পারল না, ঘরে গিয়ে সোফায় অর্ধশায়িত ভঙ্গীতে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে বসল,

পার্টির রাত্রে হঠাৎ মধ্যরাত্রিতে জয়তীর পালাবার চেষ্টার অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেল, হয়ত সেইদিনই ওরা স্থির করেছিল এখানে আর এভাবে চলবে না আর জয়তী তাই রাতারাতি পালাচ্ছিল, অথচ দিল্লী ছেড়ে যাচ্ছে না।

পালাবার প্রকৃত কারণটি সানন্দার কাছ গোপন রাখার উদ্দেশ্য ছিল বলেই জয়তী না বলা না কওয়া ঐভাবে পালিয়ে যাচ্ছিল, তারপর যখন জয়তীকে বাধ্য হয়ে থাকতে হ'ল, ধরা পড়ার ভয়ে রঞ্জিৎ যা হয় একটা অছিলা করে কলকাতা পালিয়েছিল। বরাবরই সানন্দার সন্দেহ ছিল জয়তীর এই পালাই পালাই ধ্বনির পিছনে রঞ্জিতের কোনও হাত আছে। এখন বোঝা গেল সে ধারণা সত্য।

এই কারণেই জয়ন্তী বেচারী রঞ্জিৎ যাবার পর প্রথমটায় ডাক্তারের সঙ্গে বেরোতে চায়নি। মনে মনে একনিষ্ঠত্বের দিকে হয়ত একটা ঝোঁক ছিল। তারপর হয়ত ভাবলে যে কেন মিছিমিছি মরি, যা নগৎ পাওয়া যায় তাই ভালো, তাই নতুন লোকের পিছনে যেতে আর আপত্তি করে নি। ডাক্তারের বন্ধুত্ব সহাস্যে গ্রহণ করেছে।

সানন্দার স্বাভাবিক বুদ্ধি কিঞ্চিৎ স্থূল, সেই বুদ্ধির দৌলতে সে এই ভাবে শাস্তি পেল তবু জয়তীর অদৃষ্ট ভালো যে ডাক্তারের মত সরল প্রকৃতির লোকের সাহচার্য মিলেছে, যার মনে হয়ত নিছক বন্ধুত্ব ছাড়া সৌখীন রোমান্সের কোন ছোঁয়াচ ছিল না। জয়তী হয়ত সেই জাতের মেয়ে যাদের অন্তরে ভালবাসাই প্রধান, তারা যাকে মন সমর্পণ করে বসে আজীবন তার স্মৃতি বুকে বয়ে বেড়ায়।

রঞ্জিৎ ঘরে ঢুক্‌লে তার মুখ থেকে সব সংবাদ সংগ্রহ করে নিতে হবে সেই সবচেয়ে ভালো হবে। যে-সন্দেহ সানন্দার মনে উঁকি দিচ্ছে তার,. সমর্থন মিল্‌বে, তাছাড়া রঞ্জিৎকে চটাতে ভারী মজা লাগে—বেচারী !

কিছু পরেই রঞ্জিৎ ওপরে উঠে এল। যথারীতি সাধারণ বাণী বিনিময়ের পর, সানন্দা প্রশ্ন করল হঠাৎ অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনের হেতু কি। রঞ্জিৎ চিঠির তারিখের উল্লেখ করল, সানন্দার দ্রুত রোগ মুক্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করল—তারপর বৈষয়িক কথাবার্তা, সেই কারণে কি পরিমাণ পরিশ্রম কর্‌তে হয়েছে, আর শরীর যে অবসাদমগ্ন হয়ে পড়েছে তা জানালো।

সানন্দা চুপ করে সব শুন্‌ল···তারপর সহসা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে নয়নে কটাক্ষ টেনে বল্‌ল—আচ্ছা তুমি যেন দিন দিন গম্ভীর হয়ে পড়্‌ছ, ব্যাপার কি, জয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু বেড়াতে পারো ত' ?

সানন্দার এই সহৃদয়· প্রস্তাবে সচকিত হয়ে রঞ্জিৎ বল্‌ল—কেন ? আমার কি আর কাজ নেই ?

—না তা কেন, আজ সকালে বল্‌ছিল কিনা শীগ্‌গীর চলে যাবে তাই বল্‌ছিলুম।

—ভালো, প্রয়োজন থাকে যাবে।

—তুমি ত' বল্‌ছ ভালো, আমি যে ছাড়তে চাইনা। অনেক কাজে লাগে, তা ছাড়া আমি ওকে পছন্দ করি, মনে হয় তুমি একটু সদয় হলেই ও থেকে যায়।

রঞ্জিতের বিস্ময়ের আর সীমা নেই, সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বল্‌ল—তুমি কি বল্‌ছ নন্দা ? ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

—এর আর ব্যাপার কি ? জয়া ঠাণ্ডা প্রকৃতির মেয়ে, বড় বেশি

লাজুক, তবু মেয়ে ভালো, তোমার ওপর একটু টান আছে লক্ষ্য করেছি, আমার মনে হয় জন্যই ও যেতে চায়, তোমার কথা উঠ্‌লে বেচারীর মুখ চোখ রাঙা হয়ে ওঠে।

রঞ্জিৎ কোনও উত্তর দিল না, কিন্তু তার কপালের কুঞ্চিত রেখা ও মুখের বিরক্ত অভিব্যক্তি সানন্দার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। রঞ্জিৎ রেগে উঠ্‌লেই ওর মুখভংগী এমনই লাল হয়ে ওঠে, এতক্ষণে সানন্দা বুঝ্‌ল তার অনুমানই সত্য।

রঞ্জিৎ কিছুক্ষণ পরে বলে উঠ্‌ল—তোমার ভুল হয়েছে সানন্দা, তোমার বোনের ওপর তোমার ভালোবাসা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু যে যেতে চায় তাকে ধরে রাখার জন্য ফাঁদ পাত্‌তে আমি পারবো না, তোমার স্বার্থের খাতিরে অপরের অসুবিধা করার কোনো যুক্তি নেই, তোমার মত অবিবেচক মেয়ে দেখিনি—'

এই কথা বলেই গলার টাই খুল্‌তে খুল্‌তে রঞ্জিৎ সেখান থেকে চলে গেল।

সানন্দা সোফায় গা ঢেলে দিয়ে ক্ষণকাল চুপ করে বসে রইল, তার গালে সূক্ষ্ম লাল আভা দেখা যাচ্ছে, জয়তীর ওপর রঞ্জিতেরও আকর্ষণ কম নয় বোঝা গেল, সানন্দার অনুমান সত্য হয়ে উঠেছে, বিষয়টির গুরুত্ব চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে—সহসা সানন্দা উঠে দাঁড়াল, মুখে তার কুটিল হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল—ক্রমশঃ সেই হাসি মিলিয়ে গিয়ে চোখের কোন সজল হয়ে উঠ্‌ল, সানন্দাও রমণী, যতই সে আধুনিক ও উচ্ছৃঙ্খল হোক, তার অন্তরস্থ নারী প্রকৃতির চিরন্তন অনুভূতি চাপা গেল না। সানন্দা বোধ করি এই সর্বপ্রথম নিজের চরিত্রের দৈন্য অনুভব করল, বুঝ্‌ল নারী হিসাবে সে অসার্থক হয়ে

উঠেছে, আর তার কোনো মূল্য নেই। সানন্দা রমণী—সানন্দা ঘরণী, সানন্দা স্ত্রী—সব দিকেই কেমন যেন একটা সাফল্যহীন অসঙ্গতি। রঞ্জিতের জীবন যে অসার্থক করে তুল্‌তে পারত, আজ তার নিজের জীবনই সহসা নিরর্থক হয়ে উঠেছে। বিবাহের সময়ে রঞ্জিংকে সানন্দাব ভালো লেগেছিল, রঞ্জিতেরও জীবনের পরিকল্পনা ছিল, হৃদয়ে ভাবাবেগ ছিল। সানন্দা সেই জীবন বিফল করে তুলেছে, তবু স্বার্থপরের মত সম্পদের মোহে রঞ্জিৎ ছাড়্‌তে পারে নি. সম্পদ, সম্ভ্রম ও সমাজের ভয়ে সানন্দা এখনও এ সংসারে পড়ে আছে. নইলে সে আজ অনেক দূরে চলে যেতে পারত।

এখন রঞ্জিৎ স্বয়ং তাকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়, যে এসে তার হৃদয় অধিকার করে বসেছে সে সানন্দারই আত্মীয়া, সানন্দার আহ্বানেই এখানে এসে উঠেছে। নিঃসন্দেহে উভয়ের মধ্যে প্রেম সঞ্চারিত হয়েছে, কিন্তু জয়ন্তী যে বেশিদূর যেতে পার্‌বে না সে বিশ্বাস সানন্দার আছে. কারণ জয়ন্তীর সাধ থাক্‌তে পারে সাধ্যের অভাব আছে।

এই আবিষ্কার সানন্দার মনে গভীর আঘাত হেনেছে কি ভয়ংকর অবস্থা, কি দুঃসাহস! ঠিক এই মুহূর্তে সমস্ত বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করাও যেন সানন্দার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। কি সে কর্‌বে? কম্‌রেড বলেছিল—কালসাপ পোষা হচ্ছে, কথাটা যে এমনই কঠোর সত্যে পরিণত হবে তা কে জান্‌ত। কম্‌রেড বম্বে গেছে, তার সঙ্গে পরামর্শ করার উপায় নেই, অথচ বিষয়টি এমনই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ যে এখনই একটা মীমাংসার প্রয়োজন। সহসা মনে হ'ল ডাক্তার মৈত্রকে ডেকে একটা আলোচনা করা চলে। ডাক্তারের মাথা পরিষ্কার, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ. সানন্দার চাইতে আরো সহজে ও সরল

ভাবে ব্যাপারটি বোঝা বা বোঝান হয়ত ডাক্তারের পক্ষে সহজ হবে, জয়তীর মনের অনেকটা খবর ত' সে পেয়েছে। জয়তী অবশ্য বলেছে উভয়ের মধ্যে সখ্যতা ছাড়া আর কোনও সংযোগ নেই,—ডাঃ মৈত্রের মুখ থেকে অপর পক্ষের সংবাদ জানা উচিত। বিশেষতঃ বর্তমান ব্যাপারে ডাক্তার যখন কতকটা নিরপেক্ষ।

সানন্দা টেলিফোনের রিসিভারটি তুলে ডাক্তারের ঠিকানায় সংবাদ পাঠালো। ডাক্তার স্বয়ং অপর প্রান্ত থেকে আওয়াজ দিলেন - হ্যালোও—'

—হ্যালো—ডাক্তার নাকি ?

—স্পিকিং, সানন্দা দেবী ?

—হ্যাঁ আমিই কথা বল্‌ছি—

—হঠাৎ যে ? পা কেমন ? শরীর ভালো ত' ?

—সে সব ঠিক আছে, শুনুন সন্ধ্যার পর একবার আস্‌বেন ?

—দরকারী কথা আছে ?—কাজ আছে কিছু ?

—না এমন কিছু কাজ নেই,

—বেশ যাবো, কখন যেতে হ'বে ?

—সাড়ে আটটা, এখানেই একটু কফি খাওয়া যাবে, পাকড়াশী হয়ত থাকবে না, একটু নিরিবিলি কথা বল্‌তে চাই।

—বড় জটিল হয়ে উঠ্‌ছে যে, মিঃ পাকড়াশী ফিরেছেন ?

হ্যাঁ—আজই ফিরেছেন তুফান মেলে!

—আচ্ছা, তাহ'লে ঐ সাড়ে আটটাতেই যাবো।

—হ্যাঁ, আস্‌বেন কিন্তু—নমস্কার।

অপর প্রান্ত থেকে প্রতিধ্বনিত হ'ল—ন ম স্কা র!

সানন্দা রিসিভার নামিয়ে যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌ল।

কফি পর্ব শেষ হ'ল,

রঞ্জিৎ শহরের দিকে গিয়েছেন, জয়তী নিজের ঘরে বসে আছে হয়ত, ডাঃ মৈত্র সিগ্রেট ধরিয়ে বল্লেন—তারপর হঠাৎ এই জরুরী কলের অর্থ ত' বুঝলাম না।

ডাক্তার কিছুতেই কল্পনা করতে পারছিলেন না নিরিবিলি সানন্দা কি কথা কইতে পারে, তবে কি জয়তী ভয় পেয়ে তার সম্মতি জানিয়েছে, ডাক্তারকে স্পষ্ট বল্‌তে যে সংকোচ আছে সেটুকু কাটাবার জন্য সানন্দার দূতিয়ালী গ্রহণ করেছে, কে জানে? সানন্দা কখনও কারো কাছে পরামর্শ চায় না, সেই সকলকে উপদেশ দিয়ে থাকে, যা নিজের ভালো লাগে তাই করে, নিজের ইচ্ছায় চলে, অপরের ভালো লাগা না লাগায় তার মাথাব্যাথা নেই।

সুতরাং এই আকস্মিক আহ্বান ও গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির আবহাওয়া ডাক্তারের চোখে আশ্চর্য মনে হয়। দীর্ঘকাল তিনি সানন্দার চিকিৎসক, কিন্তু এই ভঙ্গীতে কখনও তাকে দেখেন নি। আজ যেন সে পরাজিত, হঠাৎ একটা ভীষণ সংগ্রামে পরাহত হয়ে সাময়িক বিরতির অবসরে বিশ্রাম উপভোগ করছে। সাধারণ অবস্থার বাইরে সহসা অ-সাধারণ কিছু ঘটেছে।

—হঠাৎ ডাক্‌লেন যে?

সানন্দা কফির পেয়ালা শেষ চুমুকে নিঃশেষিত করে টেবিলে নামিয়ে রেখে নখের রঞ্জিত রক্তাক্ত অংশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পিকিনিজ কুকুরটাকে অকারণে একটু আদর জানিয়ে বল্‌লে—আজ আর দেহের চিকিৎসা নয় ডাক্তারবাবু, একটু মনের চিকিৎসার প্রয়োজন, অর্থাৎ দু-একটি ধাঁধার জবাব দিতে হবে—

ডাক্তার বিস্ময়াহত দৃষ্টিতে সানন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, আশা সানন্দা কথা শেষ করবে, কিন্তু সানন্দা নিজেই ভেবে পায়না কি ভাবে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করবে—ডাক্তার তাই তার বক্তব্যের সূত্র ধরিয়ে বলেন—কি সম্বন্ধে বলুন ত'? কমরেড চৌধুরী সম্বন্ধে কিছু!

—চৌধুরী? তার কথা আপনি জানলেন কি করে? কে বলেছে—'

—জয়তী বল্‌ছিলেন, কথার ভাবে বুঝলাম, জয়তী দেবী চৌধুরীর ওপর তেমন প্রসন্ন নন,—

—প্রসন্ন আর অপ্রসন্ন, তাতে চৌধুরীর কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি আছে? কি বল্‌ছিল?

—সেদিন কফি হাউসে গিছ্‌লাম, চৌধুরী দূরে একটা টেবিলে বসেছিলেন, আর ও দু-চারজন ছিলেন, একজনের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ী, একজনের মাথায় ফেজ, একজনের গান্ধী টুপী, আর ছিলেন একজন কর্পোরাল র‍্যাঙ্কের ব্রিটিশ সোলজার। জয়তী ব্যঙ্গ করে বল্লে, দেখ্‌ছেন ঐ একটি ইংরেজকে ঘিরে এতগুলি এদেশী ইনটেলেকচুয়াল গণজাগরণের আলোচনা করছেন। ওই যেন চার্চিল এ্যাটলীর প্রতিনিধি। বিষয় এও আমাদের সেই সনাতন শ্লেভ্‌ মেনটালিটি, শাদা চামড়ার ওপর একটা অহেতুক মোহ। বুঝ্‌লাম কম্‌রেডের ওপর জয়তীর আক্রোশ আছে।

সানন্দা ঠোঁটটি ঈষৎ দংশন করে বল্লে—ওর একটু পলিটিক্‌সে ঝোঁক্‌ আছে, বারণ করেছি, তবু কথা শোনে না, সাবধান করে দেব—'

—একটু নয়, বিশেষ সম্পর্ক আছে, সব কথা আপনার জানা নেই। আমি কিছু খবর পেয়েছি, আমার পিশেমশায়ের ভাইপো এখানকার ইনটেলিজেন্স অফিসর তার মুখে কিছু শুনেছি।

—কি সর্বনাশ! চৌধুরী ঠিকই বলেছিল কালসাপ পোষা হচ্ছে? কবে একটা কাণ্ড বাধাবে দেখ্‌ছি, আমি ভাব্‌তুম এমনই বুঝি—'

—ও সব মেয়ে ঐ রকম, আপনার কথাও একটু বল্‌ছিল, এ্যাক্‌সিডেণ্টের রাত্রে চৌধুরী নাকি সঙ্গেই ছিলেন—

—ন্যুইসেন্স! তাতে হয়েছে কি? কিন্তু ওসব কথা এখন থাক, আমি অন্য ব্যাপারে ডেকেছি, মিঃ পাকড়াশী—'

—অসুখ নাকি!

—অসুখ নয়, ভালোই আছেন, কিন্তু সন্দেহ হয় এই বয়সে হয় ত প্রেমে পড়েছেন।

ডাক্তার সচকিত হয়ে সানন্দার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অর্থহীন ভাবে চেয়ে রইল। কি করে সানন্দার কানে ব্যাপারটি পৌছল, যদিই পৌছে থাকে, কতটুকু পৌছেচে কে জানে! সেই রাত্রের হোটেলের ঘটনা সানন্দার কানে পৌছান অসম্ভব। ডাক্তার নিজে সব কথা বল্‌বে কি না, বলা উচিত কি না চিন্তা করতে লাগল। গত রজনীতে জয়ন্তীকে ছেড়ে দেবার পর ডাক্তারের মনে হয়েছে তার ব্যবহার খুব অভদ্রজনোচিত হয়েছে, ঠিক এতদূর যাওয়া উচিত হয় নি, ডাক্তারের মনে তার জন্য একটু অনুশোচনা জেগেছিল। ভেবেছিল হোটেলের ভিতর যা হযেছে সে কথা পাঁচ কান করার অধিকার তাঁর নেই—কিন্তু এখন যদি সানন্দা কিছু জেনেই থাকে আর ডাক্তারের সাহায্য চায় তাহলে ডাক্তারকে বাধ্য হয়েই সব খুলে বল্‌তে হবে।

ডাক্তার ভাব্‌ল, তবু অপেক্ষা করেই দেখা যাক্‌, সানন্দাই বলুক, শোনা যাক্‌ ওর কি বক্তব্য। সানন্দার কাহিনী শুন্‌তে হলে এ বিষয়ে অজ্ঞতার ভান করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

হয়ত এ সম্পূর্ণ বিভিন্ন কাহিনী, রঞ্জিৎ পাকড়াশী দু-তিন ঘণ্টা আগে সবে দিল্লী ফিরেছে, এর মধ্যেই কোথা কিছু জটিল ব্যাপার ঘটা সম্ভব নয়; এর মধ্যেই জয়ন্তীর সঙ্গে রঞ্জিতের সংযোগ সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। হয়ত অন্য কোন মেয়ের কাহিনী। বোকার মত অসংলগ্নভাবে কম্‌রেড চৌধুরীর কথাটা তোলা উচিত হয়নি হয়ত।

ডাক্তার অত্যন্ত নিরীহের মত প্রশ্ন কর্‌লেন—মিঃ পাকড়াশীর হঠাৎ এরকম মতি হ'ল কি করে জান্‌লেন?

—জানি, আমার সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক শেষ হয়েছে, সত্যি কথা বল্‌তে হ'ল বল্‌ব অনেকদিন আগেই আমাদের দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ ঘটেছে। অন্য স্ত্রীলোকের ওপর ওঁর এখন নজর পড়েছে—'

—বলেন কি, অন্য স্ত্রীলোক?

—মানে ব্যাপারটি খুব গুরুতর না হলেও, উপেক্ষনীয় নয়, সাধারণ ঘটনা হ'লে আমি হয়ত কিছু মনে কর্‌তাম না, কিন্তু তা নয়, একটু জটিল হয়ে উঠেছে, আর যতদূর বুঝ্‌ছি আমার জন্যই তাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, হয়ত লোকলজ্জার ভয়ও আছে। আমি তা চাই না, আমার জন্যই বা এই ত্যাগ স্বীকারের কি প্রয়োজন?

সানন্দার এই অহং শূন্য বৈষ্ণব মনোভাব ডাক্তার মৈত্রের চোখে অদ্ভুত ঠেক্‌ল। আশ্চর্য পরিবর্তন! ডাক্তার বিস্মিত হয়েছে আবার কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। যে-রঞ্জিৎ সেদিনের হোটেলের ঘটনার নায়ক তার এই স্পষ্ট মনোভাব একটু বিচিত্র বটে! সানন্দার জন্য অন্য রমণীকে দূরে সরিয়ে দেবে, এতখানি ত্যাগ স্বীকারের মহত্ব পাকড়াশীর আছে এ বিশ্বাস ডাক্তারের নেই।

ডাক্তার অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বল্লেন—তাই-ত', কি করা উচিত বলুন ত'। কি করে এর মীমাংসা করা যায়!

—ঠিক মীমাংসার জন্য আপনার শরণাপন্ন হইনি ডাক্তার মৈত্র, আপনার কাছে কিছু সংবাদ চাই। পাকড়াশী আমাকে কিছু বলেন নি। আমি যা জেনেছি, যেভাবে জেনেছি তা সম্পূর্ণ আকস্মিক, তিনি জানেনও না, যে আমি এই ব্যাপারের কিছু জানি। আমাকে হয়ত কোনোদিন জানাবেও না।

—কি করে তবে জান্‌লেন ?

—প্রথমতঃ আমিও স্ত্রীলোক, আর পাকড়াশী চরিত্র আমার চাইতে আর কে বেশি বুঝ্‌বে বলুন !

—ধরা যাক্, আপনার ধারণাই সত্য। আমি কিন্তু কি সাহায্য কর্‌তে পারি।

সানন্দা কিছুক্ষণ চিন্তা করল তারপর বল্‌ল—আমার কথাগুলি ভালো করে শুন্‌বেন, তারপর প্রশ্নের জবাব দেবেন।

—বলুন !

—ব্যক্তিগতভাবে আমার অন্তরে যে এই প্রেমলীলা স্পর্শ করেনি, তাও নয়, এই ব্যাপারে তাঁর আত্মত্যাগের পরিচয়ই আছে, আমাকে লজ্জা দেবার জন্যই যেন বিষয়টি পরিকল্পিত হয়েছে।

ডাক্তারের আর গৌরিচন্দ্রিকা ভালো লাগছে না, ক্রমশঃই আসল তথ্য জানার জন্য তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন। বল্‌লেন—আপনার বক্তব্য ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনা মিসেস্ পাকড়াশী।

—বোঝাবার জন্যই ত' ডেকেছি, মন দিয়ে শুনুন।

পাকড়াশী লোক কালো, আমার সঙ্গে চৌধুরীর এই যে অন্তরঙ্গতা, পাকড়াশী তা জানে কিন্তু সে বিষয় কোনো কথাই আমাকে তিনি বলেন নি, আমিও হয়ত এ বিষয়ে মাথা ঘামাতাম না, আমার স্বামীর

সম্পর্কে একথা বলা হয়ত উচিত হল না। কিন্তু একটু কারণ আছে বলেই এই প্রশ্ন করছি—,

সানন্দার এই অপূর্ব পরিবর্ত্তন অদ্ভুত, মনোভংগী ও দুঃসাহসিক কথায় ডাক্তারের চমক লাগল। সানন্দার প্রশ্নের কি জবাব দেওয়া সম্ভব। সহসা সে আজ বিবেকের দংশনে বিস্মিত হয়ে পড়েছে, স্বামীকেও ছাড়তে চায় না অথচ চৌধুরীকেও চাই, মন্দ ব্যবস্থা নয়। ডাক্তার বোকার মত প্রশ্ন করল—চৌধুরীর সঙ্গে আপনার সম্প্রতি কি একটু মতান্তর ঘটেছে ?

—ননসেন্স্, সে কথা উঠছে কেন, চৌধুরীর পার্টির ব্যান্ উঠেছে ২৩শে জুলাই, সেই খবর পেয়েই সে বোম্বায়ে ছুটেছে, দু-একদিনের ভেতরই ফিরবে কিন্তু। আমার কথা আপনি কি বোঝেন নি ! চৌধুরীর কথা পরে আস্ছে।

—মিঃ পাকড়াশীর নূতন বান্ধবীটি কে ?

—আমার বোন্ জয়া অর্থাৎ জয়তী ! আর সেইজন্যেই আপনাকে ডেকেছি, আপনি ত' তার মনের খবর কিছু জানেন !

ডাক্তার সংক্ষেপে শুধু বল্লেন—আমি ত এই কথাই ভেবেছিলুম।

—সে কি ? কি করে একথা মনে হ'ল ! আমি ত' ভেবেছিলুম আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন। আপনার জান্বার ত' কোনো উপায় নেই ?

—অথচ আজ নয়, আমিই সবটা জানি, অনেকদিন ধরেই জানি।

—কি করে আপনি জানবেন, আমার মাথায় ত' একটুও আস্ছেনা !

—সানন্দা সত্যই চমকিত হয়েছে।

—এই "মন্জিলে" প্রবেশের পূর্বেই ওদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।

—অসম্ভব! এখানে আসার আগে ওরা কেউ কাউকে জান্‌তোই না। কি বল্‌ছেন আপনি!

—ঠিকই বল্‌ছি,—এখানে আসবার আগের রাত্রে কোসী কালানের একটা হোটেলে ওঁরা উঠেছিলেন, শুনেছিলাম সেই রাতটা থাকবার জন্যেই ব্যবস্থা হয়েছিল, তবে একত্রে ছিলেন কিনা ঠিক জানি না।

—বলেন কি? সেইখানে ওরা একরাত্তির এক সঙ্গেই ছিল? কি করে এসব কথা আপনার কানে এল?

ডাক্তার সংক্ষেপে সেই রাত্রের ঘটনা বিবৃত করলেন। ডাক্তারের কথা শেষ হবার আগেই সানন্দার মুখ শাদা হয়ে উঠেছে। রাগে সর্ব শরীর কাঁপছে—সে বলল, তারপর আবার ও এখানে এসে মুখ দেখালো কি করে? যেন কখনও পাকড়াশীকে দেখেইনি এমনই একটা ভাব দেখালে। ওদের এত ভালো বলে জান্‌তুম, ঈর্ষা করতুম,

—সবটাই তাহলে অভিনয়? আগে বলেন নি কেন?

—মিছিমিছি একটা হট্টগোল সৃষ্টি করতে চাইনি। তাইতো একটা "প্রফেসনাল অনার'ও ত' আছে। তবে আজ আপনি কথাটা তুললেন তাই বলতে হ'ল।

—আর আমি কিনা মনে মনে ভাব্‌ছি জয়াকে এই সংসার ছেড়ে দিয়ে আমি চৌধুরীর সঙ্গে চলে যাব, ছিঃ ছি:—

—বলেন কি, চৌধুরীর সঙ্গে? কিন্তু—'

—কিন্তুর কি আছে, ঠিক হয়েছিল আমি মুসলমান হয়ে যাব, নাম অনীশা বেগম, পাকড়াশীকেও বলব মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে যদি না করে তাহ'লে চৌধুরীকেই সোজা বিয়ে করব। একটু ঘোর প্যাচ, তা যতদিন না ডিভোর্স এ্যাক্ট্ হচ্ছে, এটুকু হাঙ্গাম করতেই হবে,—

—কিন্তু এখন ত' দেখছি অন্য পন্থা প্রয়োজন।

সামনের দরজায় একটা খস্ খস্ আওয়াজ শোনা গেল, কে যেন সরে গেল, সানন্দা সচকিত হয়ে বল্লে—দেখুন ত' জয়া কিনা, যদি হয় ডাকবেন—

ডাক্তার মৈত্র বাইরে ঘুরে এসে বল্লেন—কে একজন নীচে নেমে গেলেন, ঠিক বোঝা গেলনা—'

সানন্দা কম্পিত কলেবরে উঠে দাঁড়াল।

সেই রাত্রে জয়তীকে আর 'মন্‌জিলে' পাওয়া গেল না। সকালে দেখা গেল তার জিনিষপত্র, 'বেবী' কার সবই আছে, জয়তী নেই।

রঞ্জিৎ সন্ধ্যার দিকে চারদিকে সন্ধান করে ম্লান বিষন্ন মুখে ফিরে এল। সানন্দা সাগ্রহে প্রশ্ন করল কিছু খবর পাওয়া গেল?

জয়তী যে যাবেই তা উভয়েই জান্‌ত, কিন্তু হঠাৎ এ ভাবে চলে যাওয়ার হেতু দুজনেই অনুমান করেছে। জয়তীর মানসিক অবস্থার কথা ভেবেই রঞ্জিৎ আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। রঞ্জিৎ ম্লান মুখে বল্‌ল—নাঃ,

সানন্দা বল্ল, এমন সেনটিমেন্‌টাল মেয়ে দেখিনি ডাক্তারের কথা শুনেই বোধহয় পালিয়েছে—।

বিস্মিত রঞ্জিৎ প্রশ্ন করল…ডাক্তারের আবার কি কথা?

সানন্দা তিক্ত কণ্ঠে বল্‌ল—সে কথা আর শুনে কাজ কি? কোসি-কালানের হোটেলের কথা ডাক্তার না থাক্‌লে কোনোদিনই জানা যেতনা। ডাঃ মৈত্র সেই রাত্রে ঐ হোটেলে কিছুক্ষণ ছিলেন। তোমাদের ঐ ভাবে দেখে তিনি স্বভাবতই বিস্মিত হয়েছেন—

—তাইত' দেখছি, কিন্তু তুমি জানোনা ঠিক কি হয়েছে, হঠাৎ

জয়ন্তীর সঙ্গে আমার দেখা হয়, জানতুম না, ও তোমার কাছেই আসছে, কথা প্রসঙ্গে আলাপ জমে ওঠে, কিন্তু আমি তখনই সেখান থেকে পালিয়ে যাই, ডাক্তার এই ঘটনার সাহায্যে জয়ন্তীকে হাত করতে চেয়েছিলেন, সেই প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় তোমার কাছে এই বিষোদ্গার করেছে—'

—কি যে সত্যি তুমিই জানো, আমি ত' তোমাদের ভালো বলেই জানতুম, জয়া আমার বোন তাকে আমি ভালোবাসি, এখনও ভালো-ভালোবাসি—'

—আরো ভালবাসবে যেদিন তার সকল কথা জানতে পারবে জয়া সাধারণ মেয়ে নয়। দেশের কাজে সে জীবন সমর্পণ করেছে, ছোটখাটো সুখ দুঃখ, ব্যক্তিগত মোহ, ভালোবাসা তার সেই পথে কোনোদিন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবেনা। আমি তার মন জেনেছি, আমার একটা মোহ সৃষ্টি হয়েছিল, সে মোহ এখন কাটিয়ে উঠেছি—'

—জয়া কি স্বদেশী মেয়ে? তাই চৌধুরীর সঙ্গে ওর এত ঝগড়া হয়—'

—চৌধুরী? সর্বনাশ, চৌধুরী জানে জয়ন্তী কংগ্রেসের কাজ নিয়ে আছে?

—জানতেও পারে? তাতে কি হয়েছে?

—কাগজে দেখনি সরকারী লেবর ওয়েলফেয়ার অফিসর নিয়কর কি বলেছেন, ওরাই ত' কংগ্রেসের কাজে বাধা দেবে, তাই ত' ওদের দলের ওপর থেকে 'ব্যান্' তুলে নেওয়া হয়েছে!

সানন্দা শুষ্ককণ্ঠে শুধু বলল, তাই নাকি!

সানন্দার চরিত্রে যত ত্রুটীই থাকুক, এ সেই জাতের মেয়ে যাদের

রাগ বেশিক্ষন থাকেনা। জয়ন্তীর অন্তর্ধানে সানন্দা দুঃখিত হয়েছে, সহসা ডাক্তার মৈত্রের ওপর তার ভীষণ রাগ হ'ল, বল্‌ল—ডাক্তার যে এত নীচ হতে পারে আমি ভাবিনি,—তুমি জয়াকে খুঁজে বার করো—

আগস্ট মাস—

মহাত্মা গান্ধী বৃটেনের কাছে, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে, কন্‌গ্রেসের পক্ষ থেকে যে আবেদন জানিয়েছিলেন তা উপেক্ষিত হয়েছে। কন্‌গ্রেসের ৮ই আগস্ট বোম্বায়ের সভায় "ভারত ত্যাগ কর" প্রস্তাব বিপুল জয়ধ্বনিতে গৃহীত হ'ল। কিন্তু ৯ই আগস্ট রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই কনগ্রেস মহলে কেউ আর কারাপ্রাচীরের বাইরে রইলেন না।

মহাত্মাজী, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সদস্য, কস্তুরবা গান্ধী, মীরাবেন, মহাদেব দেশাই, কেউ বাকী রইল না, পথে ঘাটে খদ্দর পরিহিত, গান্ধী টুপীওলা লোক দেখ্‌লেই পুলিশ তাদের পাকড়াও কর্‌ল।

এই দিনই আহমেদাবাদে গুলী চল্‌ল—তারপর প্রত্যহ সংবাদ আস্‌তে লাগ্‌ল গ্রেপ্তার ও গুলীচালনার। কোথাও লাঠি, কোথায় ৫০ জন নিহত, কোথায় বিমান থেকে বোমা বর্ষিত হল গ্রামবাসীদের ওপর—

সারা দেশে আগুণ জ্বলে উঠ্‌ল। নেতা নেই, নেই কোনো হাতিয়ার, নেই কোনো উদ্যোগ আয়োজন, নেই কোনো পরিকল্পনা, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, লোকে উন্মত্ত আগ্রহে দেশের কাজে এগিয়ে এল। সবাই এল—কিন্তু একদল লোক কেবল বলে বেড়াতে লাগ্‌ল যারা এই সব আন্দোলনে যোগ দিয়েছে তারা পঞ্চম বাহিনীর লোক, তারা দেশের সম্মানীয় নেতাদের নামে কলঙ্ক প্রচার কর্‌তে

লাগ্‌ল, পুলিশের লরীতে চড়ে লাউড্‌ স্পীকার নিয়ে 'জনযুদ্ধের বিরোধী এই আগস্ট বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালালো।

সমগ্র ভারতে এক অপূর্ব গণজাগরণ লক্ষিত হ'ল।

পদ্মাবতী দেবী আন্দোলনের প্রথম দিকেই ধরা পড়্‌লেন,—পর্যায়ক্রমে জয়তীর কাঁধে নেমে এল নেতৃত্বের ভার, নারী বাহিনীর পরিচালনা তার হাতে, দিল্লীর চাঁদনী চকের ঘড়ির নীচে দাঁড়িয়ে জয়তী একদিন বক্তৃতা দিল। উন্মত্তের মত জনতা তাকে নিয়ে সারা শহরে ঘুরল, পুলিশ লাঠি চালালো, গুলী চালালো, জয়তী এক সময় সেই গোলমালের ভিতর থেকে নির্বিঘ্নে সরে গেল।

২৩শে সেপ্‌টেম্বর—

সন্ধ্যার দিকে জয়তী একটা টাঙ্গায় চড়ে মন্‌জিলে ফিরছে, সানন্দা ও রঞ্জিৎএর সঙ্গে শেষ দেখা করে যাবে। আর হয়ত দেখাই হবেনা কোনোদিন, বৃথা কেন অভিমান আর অবিশ্বাস।

মন্‌জিলের গেটের সামনে দূর হতে দেখা গেল অসংখ্য লাল পাগড়ীর ভিড়, পুলিশের ভ্যানের এক পাশে দাঁড়িয়ে কম্‌রেড চৌধুরী নির্বিকার চিত্তে পাইপ টান্‌ছেন, আর একজন পুলিশ অফিসার হাসছেন।

জয়তী বুঝ্‌লো, কি যে ব্যাপার সহজেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। জয়তী টাঙ্গাওলাকে বল্‌ল—জল্‌দি ঘুমাও, করোলবাগ—'

এত কাছাকাছি এসেও জয়তী সরে গেল।

সেই থেকে জয়ন্তীর আর সন্ধান নেই; এদিকে তাকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হ'ল পুরস্কারের পরিমাণ ক্রমেই বাড়তে লাগ্‌ল, জয়ন্তীকে কিন্তু আর পাওয়া গেল না। নিরুপায় হয়ে অবশেষে একদিন জয়ন্তীর একমাত্র সম্পদ সেই বেবী কারখানি সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিলেন।

জয়ন্তীর বেবী গাড়ি, পুলিশের বাহিনী, ক্রমেই দূরে মিলিয়ে গেল, রঞ্জিৎ পাকড়াশী রুমালে চোখ ঢাক্‌লো।

সানন্দা উদ্‌গত অশ্রু আর রোধ কর্‌তে পার্‌ল না, রঞ্জিতের বুকের ওপর কান্নায় ভেঙে পড়্‌ল।

শেষ